ভদ্দরলোক

নিমাই ভট্টাচার্য

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-১৩

ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোক

কয়েক দিন রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার পরই বুঝলাম, খবরের কাগজের আসল হর্তা-কর্তা-বিধাতা হচ্ছেন নিউজ এডিটর। বার্তা সম্পাদক।

সংবাদপত্রের খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব রিপোর্টারদের।

স্টাফ রিপোর্টার ও বিশেষ সংবাদদাতারা সরাসরি নিজ নিজ পত্রিকায় লেখেন।

টেলিপ্রিন্টারে রয়টার, এ. পি., ইউ. পি. আই, এ. এফ. পি বা পি. টি. আই-এর যে সব খবর আসে, সে-সবও রিপোর্টারদের সংগ্রহ করা খবর।

রিপোর্টারদের সংগ্রহ করা 'খাদ্য' রান্না করার দায়িত্ব সাবএডিটরদের।

কিন্তু আসল বড় গিন্নীমা হচ্ছেন নিউজ এডিটর।

সংবাদপত্র-সংসারের বড়কর্তা সম্পাদক হলেও বড় গিন্নীমার হাতেই সব চাবি-কাঠি। তিনি যেভাবে যা খেতে দেবেন, সম্পাদক মশাইকেও তাই খেতে হবে। যে পোশাক পরতে দেবেন, সেই পোশাকেই পরের দিন ভোরে সংবাদপত্রকে দেখা যাবে।

এই তথ্য ও সত্য জানার পর থেকে আমি সুযোগ পেলেই আমাদের রিপোর্টারদের ঘর ছেড়ে নিউজ ডিপার্টমেন্টে কিছু সময় কাটাই। এই নিউজ ডিপার্টমেন্টের কোণার বড় টেবিলের অধিকর্তা আমাদের নিউজ এডিটর।

পুরো নাম অক্ষয়কুমার চৌধুরী। অফিসের সবাই ওঁকে অক্ষয়দা বলে ডাকেন।

অক্ষয়দা বলে ডাকলেও উনি দাদার বয়সী ছিলেন না—ছিলেন দাতুর বয়সী।

অক্ষয়দার জন্ম কাটোয়ায়। ওঁর বাবা সরকারী অফিসের মাঝারি আমলা ছিলেন বলে বদলী হয়ে ঘুরে বেড়াতেন নোয়াখালি চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া, দার্জিলিং থেকে খুলনা। তাই অক্ষয়দার স্কুলজীবন কেটেছে অবিভক্ত বাংলার নানা মহকুমা ও জেলা শহরে।

তুটি বিষয়ে 'লেটার' নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে এণ্ট্রান্স পাশ করার পর আই. এ. পড়েন যশোর জেলার নড়াইল কলেজে ও বি. এ. পড়েন ঢাকার জগন্নাথ কলেজে।

ভবিষ্যতে একজন শিক্ষক, অধ্যাপক বা সরকারী আমলা হবার জন্যই অক্ষয়দা তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু ঢাকায় এসেই গণ্ডগোল হয়ে গেল। ইংরেজি অনার্সের ছাত্র হলেও অক্ষয়দার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল ইতিহাসের ছাত্র ত্রিদিবের সঙ্গে।

এই ত্রিদিবের পাল্লায় পড়েই সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

কোনদিন রমনার মাঠের এক কোণায় বা কোন দিন সেই সদরঘাটের এক ধারে বসে তুই বন্ধুতে গল্প হয়।

গল্প মানে নানা আলোচনা।

একদিন সাহিত্যের আলোচনা হলে তিনদিন দেশের-দশের বিষয়ে আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হবেই।

তবে নেহাতই উপসংহারে।

সেদিন রমনার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের এক কোণায় বসে তুই বন্ধু আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সূর্য অস্ত যাবার একটু পরেই অক্ষয়দা বললেন, চল ত্রিদিব, এবার উঠি।

বস, বস। এত ব্যস্ত কী?

আবার কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর অক্ষয়দা বললেন, চল ত্রিদিব, এবার ওঠা যাক। অন্ধকার হয়ে এলো।

ত্রিদিব একটু হেসে বললেন, অন্ধকার যখন হয়েই এসেছে তখন আরো একটু অন্ধকার হোক।

অক্ষয়দা একটু হেসে বললেন, তুমিই তো রোজ আমাকে তাড়া দাও। আর আজ তুমিই বলছ…

এই অন্ধকারে বসে থাকতে সত্যি ভাল লাগছে।

দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই অন্ধকার বেশ গাঢ় হতেই হঠাৎ কোথা থেকে নীলমনি এসে হাজির।

অক্ষয়দা অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি! তুমি কী করে জানলে আমরা এখানে আছি?

নীলমনি হেসে বললেন, তোমরা গল্প কর। আমি এখুনি চলে যাব। এবার খবরের কাগজের একটা প্যাকেট ত্রিদিবকে দিয়ে বললেন, টিকটিকি পিছনে লেগেছে মনে হচ্ছে। তুমি এটা খোকনদাকে পৌঁছে দিও।

ত্রিদিব প্যাকেটটা সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবির পকেটে রেখে বললেন, সাবধানে থেকো।

আচ্ছা। বলে নীলমনি আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন তা অক্ষয়দা বুঝতেও পারলেন না।

ত্রিদিবকে বেশ চিন্তিত দেখে একটু চুপ করে থাকার পর অক্ষয়দা জিজ্ঞেস করলেন, প্যাকেটে কী আছে?

এমন কিছু না, একটা পিস্তল।

অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে ত্রিদিব জবাব দিলেন।

পিস্…!

অক্ষয়দা ভয়ে কথাটা শেষ করতে পারেন না।

এবার ত্রিদিব হেসে বললেন, হ্যাঁ, পিস্তল।

পরের দিন ভোরেই নীলমনি গ্রেপ্তার হল। তার তিন দিন পর ত্রিদিব।

প্রিয় বন্ধু ত্রিদিবকে পুলিশ এমন মারধোর করতে করতে হস্টেল থেকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল যে অক্ষয়দা আর সহ্য করতে পারলেন না। মোষের মত কালো আর মোটা যে এ-এস-আই ত্রিদিবকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল, অক্ষয়দা হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে তার পেটে এমন লাথি মারলেন যে সে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়দার হাতেও হাতকড়া পড়ল।

অক্ষয়দা হাসতে হাসতে আমাদের বলেছিলেন, তবে সেবার বেশীদিন রাজবাড়ির নেমন্তন্ন খাবার সুযোগ হয়নি। একে ভাল ছাত্র ছিলাম, তার ওপর বাবা রাজকর্মচারী ছিলেন বলে ফাইনাল পরীক্ষার দু'মাস আগেই আমাকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল থেকে তাড়িয়ে দিল।

আমরা চুপ করে অক্ষয়দার কথা শুনি। কেউ কোন প্রশ্ন করি না। সবাই ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকি।

উনি হাসিমুখেই বলে যান, মাত্র দেড়মাস জেলখানায় কাটিয়েই এত ভাল লাগল যে আবার জেলে যাবার জন্য মন পাগল হয়ে উঠল। ছোটবেলা থেকে ইংরেজকে ভয় করতে শিখলেও ঐ দেড়মাসে সব ভয় কেটে গেল।

তারপর পরীক্ষা দিয়েই পুরোপুরি খেলায় নেমে পড়লাম।

তারপর আমরা আরো অনেকে অনেক প্রশ্ন করি কিন্তু অক্ষয়দা টেলিপ্রিণ্টারের কপির ওপর চোখ বুলাতে থাকেন।

তারপর এক সময় বলেন, আমি কি সি. আর. দাশ না সুভাষবাবু যে আমার জীবনকাহিনী তোমাদের জানতে হবে?

দু-একজন সাব-এডিটর আরো দু-একবার অনুরোধ করতেই উনি বললেন, না না, আর গল্প নয়। কাল কি কাগজ বের হবে না?

ব্যস! সবাই চুপ। আর কেউ কোন প্রশ্ন না করে যে যার কাজ শুরু করেন।

অক্ষয়দা বোধ হয় সত্তরের ঘরে পা দিয়েছিলেন কিন্তু তা হলেও রোগা ছিপছিপে ঋজু দেহ ছিল তাঁর। মোটা লেন্সের চশমা থাকলেও তাঁর দুটি উজ্জ্বল চোখ সবারই দৃষ্টি কেড়ে নিত।

ওঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর প্রখর স্মৃতিশক্তি বাংলা সংবাদপত্র জগতে প্রায় কিংবদন্তী ছিল।

সি. আর. দাশ বরিশাল কনফারেন্সে কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন বা সুভাষবাবু কবে আলিপুর জেলে ঢুকেছেন-বেরিয়েছেন, এ সব প্রায় কবিতার মত মুখস্থ ছিল তাঁর।

আর ভাষা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে আমরা স্তম্ভিত না হয়ে পারতাম না। সম্পাদক থেকে শুরু করে রিপোর্টার-সাব-এডিটরের মধ্যে কেউ কোন শব্দের অপব্যবহার করলেই আর নিস্তার ছিল না।

সম্পাদকমশাই কি কারণে নিউজ ডিপার্টমেন্টে ঢুকতেই অক্ষয়দা বললেন, আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কাঁধের চাদরটা ঠিক করতে করতে সম্পাদকমশাই বললেন, কেন? কোন দরকার আছে?

দরকার আমার না, আপনার।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অক্ষয়দা সবার সামনেই ওকে বললেন, বিপ্লব শব্দটার এত অপব্যবহার করবেন না। বিপ্লব শব্দটির অনেক মানে হয়। যেমন ভাসা, নাশ, অত্যাচার, অরাজকতা, উচ্ছেদ, পরনৃপতির ভয়, ব্যতিক্রম ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্পাদকমশাই যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। আর আমরা সবাই দর্শকের ভূমিকায়।

উনি এক নিশ্বাসে বলে যেতে থাকেন, তাছাড়া পরিপূরক হিসেবে বিপ্লব শব্দটির নানা রকম ব্যবহার হয়েছে ও হয়। যাই হোক একটু সাবধানে শব্দটা ব্যবহার করবেন।

যত দূর শুনেছি, সি. আর. দাশই অক্ষয়দাকে প্রথম খবরের কাগজের জগতে আনেন। খবরের কাগজের ব্যাপারে জে. এম. সেনগুপ্তা বা সুভাষচন্দ্রও ওঁর সাহায্য নিয়েছেন।

তারপর আরো কত কাগজে কাজ করেছেন। অবসর নিলেও অলস জীবন কাটাতে পারেন না বলেই আমাদের কাগজে ওঁকে ধরে আনা হয়েছে।

অফিসে আসেন বেলা করে কিন্তু বাড়ি যান মাঝরাত্তিরের পর।

খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ঐ রোগা ছিপছিপে লোকটি অফিসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা অফিসের চেহারা বদলে যায়। যারা চিৎকার না করে কথা বলতে পারেন না, তারাও মিহি সুরে কথা বলতে শুরু করেন।

ইয়ার্কিফাজলামী সব বন্ধ।

অক্ষয়দা এক মিনিট সময় নষ্ট করেন না। কথাবার্তা প্রায় বলেন না বললেই চলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে দু-একটি কথায় তার জবাব দেবেন।

ব্যতিক্রম কী ঘটে না? ঘটে, তবে কদাচিৎ কখনও। সে ব্যতিক্রমের দিন আমরা সবাই প্রায় পেখম তুলে নাচতে শুরু করি।

এই রকম ব্যতিক্রমের দিন অক্ষয়দা জেলের গল্প, বিপ্লবী বন্ধুদের কথা, সাংবাদিক হিসেবে নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাতেন আর আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আমি মনে মনে ওঁকে প্রায় দেবতা-জ্ঞানে পূজা করতাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন হোঁচট খেলাম, যা চিন্তা তো দূরের কথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। তাছাড়া খবরের চাপ একেবারেই ছিল না। মুড়ি-তেলেভাজা খেতে খেতে আমরা নিউজ ডিপার্টমেন্টে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

এমন সময় অক্ষয়দা ঘরে ঢুকতেই সবাই চুপ।

পানিনির মানস-পুত্র ও আমাদের প্রবীণ প্রুফ-রীডার কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অক্ষয়দা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, কী এমন রসের আলোচনা হচ্ছিল যে আমি ঘরে ঢুকতেই সবাই বোবা হয়ে গেলে?

তেমন কিছু না। এমনি আষাঢ়ে গল্প হচ্ছিল।

অক্ষয়দা নিজের জায়গায় ঠিকঠাক হয়ে বসে একটু সময় কাজকর্ম দেখার পরই বৃদ্ধ সাব-এডিটর নিত্যানন্দদা বললেন, এমন দিনে কাজকর্ম করতে মন লাগে না।

অক্ষয়দা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কেন? তুমিও কী আমারই মত এমনি বৃষ্টির দিনে প্রথম মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করেছিলে?

এঁ্যা!

আমরা সবাই চমকে উঠি। প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় যেন।

দু-চার মিনিট বোধ হয় আমরা সবাই অপলক দৃষ্টিতে স্তম্ভিত হয়ে অক্ষয়দার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

কেষ্টদা তা লক্ষ্য করে অক্ষয়দাকে বললেন, তোমার কথা শুনে এরা সবাই অবাক।

কেন? আমি কী রক্ত-মাংসের মানুষ না?

অত্যন্ত সহজ ভাবে উনি বললেন।

নিত্যানন্দদা একটু হেসে ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ঐতিহাসিক ঘটনা কোথায় ঘটেছিল, তা বলবে না?

চাঁদপুরে।

আর কিছু বলবে না?

আবার কি বলব?

সব কিছু।

হঠাৎ হাতের কলম নামিয়ে রেখে অক্ষয়দা বললেন, অত যখন রস, তখন শোন···

এম. এ পড়ার সময় প্রথম বছরটায় বিশেষ কোন ঝামেলা হল না।

শুধু সপ্তাহে একদিন করে থানায় হাজিরা দিতে হত। আর আই. বি. ইন্সপেক্টর সদানন্দ ভট্চায মাঝে মাঝে হঠাৎ উদয় হয়ে জিজ্ঞেস করত, কি অক্ষয়, পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ?

ভালই।

পাশ করে কি করবে ? প্রফেসারী ? নাকি ল' পড়বে ?

না না, ল' পড়ব না।

কেন ? ওকালতী তোমার ভাল লাগে না ?

একদম না। বড্ড মিথ্যে কথা বলতে হয়।

সদানন্দ ইন্সপেক্টর হো হো করে হেসে বলেন, তা ঠিক।

ন্যাকামী করে এই ধরনের কথাবার্তা বলার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুরা কেমন পড়াশুনা করছে ?

মোটামুটি সবাই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু নীলমনি পড়ে কখন ? শুনি, ও তো নাকি অনেক দিন রাত্রে হস্টেলেই ফেরে না।

একদম বাজে কথা। অক্ষয়দা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, নীলমনি কোন কালেই দিনে পড়তে পারে না। ও ফার্স্ট ব্যাচে খেয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে পড়তে বসে।

আচ্ছা!

হ্যাঁ, ও মোটামুটি ভোর চারটে—সাড়ে চারটে পর্যন্ত রোজই পড়ে।

যাক বাবা, পড়াশুনা করে মানুষ হোক। আলতু-ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে তো ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

অক্ষয়দা নিজে উদ্যোগী হয়ে কোন কথা বলেন না। সদানন্দ দারোগাই একটু থেমে আবার বলেন, ভালো কথা, আমার বন্ধুর ছেলে তোমাদের হস্টেলেই থাকে। ছেলেটির নাম হিমাদ্রি সরকার। তুমি নিশ্চয়ই চেনো ?

একটু ভেবে অক্ষয়দা জবাব দেন, না, হিমাদ্রি নামের কোন ছেলেকে তো চিনি না। বোধ হয় নতুন এসেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নতুন এসেছে। তবে ছেলেটি যেমন ভাল, তেমন আদর্শবাদী।

অক্ষয়দা মনে মনে হাসেন। শালা, সব খবরই রাখে।

এই ভাবেই বছরটা কেটে গেল। সিক্সথ্ ইয়ারে ওঠার পরই ঢাকার বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে দিল ত্রিদিব। হ্যারিসন সাহেব নিজের পিস্তল থেকে পর পর চারটে গুলী মেরে খোকনদাকে মারার পরই ওরা ঠিক করল, আর নয়, যেভাবেই হোক ও-শালাকে শিক্ষা দিতেই হবে।

অনেক খোঁজখবর নেবার পর জানা গেল, উনত্রিশে মার্চ হ্যারিসন সাহেব বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য মেমসাহেবকে নিয়ে লঞ্চে বেড়াতে বেরুবেন। খানাপিনাও ঐ লঞ্চে হবে কিনা, তা অবশ্য ঠিক জানা গেল না।

মাহুতটুলীর এক সরু গলিতে শ্রীনাথ কবিরাজের ভাঙা দোতলা বাড়ির এক অন্ধকার ঘরে বসে মানিকদা ওদের সব বুঝিয়ে দিলেন। সাতাশে ভোরবেলায় সদরঘাটের এক কোণার দিকে রিহার্সালও হল।

মানিকদা বললেন, পরশুদিন বিকেলের আগে তোমরা কেউ বাড়ি বা হস্টেলের বাইরে বেরুবে না। আমি চাঁদপুরের ঐ লঞ্চটার খালাসী হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পরই তোমরা আস্তে আস্তে যে যার পজিশান নেবে।

সবাই মাথা নাড়ল।

আর হ্যাঁ, ত্রিদিব, তুমি কিন্তু ভুল করেও জুতো পায়ে দিও না। জুতো পায়ে দিলেই তোমাকে লম্বা দেখাবে। ত্রিদিব মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

উনত্রিশে মার্চ। সদরঘাট।

একটা ভাঙা লাল ট্রাঙ্কের ওপর বোরখা পরে এক জেনানা বসে। পাশে তার মরদ মনের সুখে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হুঁকো টানছে। চারপাশে লোকজনের ভীড়। কেউ বেশী কাছাকাছি এলেই উনি মুচকি

হেসে জিজ্ঞেস করেন, কী মিঁয়া, এ আমার বিবি না কি তোমার? নিজের কী কামকাজ নেই যে পরের বিবি খাখনের লোভে সদরঘাটে ঘুরপাক খাও?

খানিকটা দূরে একটা ফলওয়ালা তারস্বরে চিৎকার করে খদ্দের ডাকছে।

তার কাছাকাছিই এক ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করছেন কোট-প্যান্টপরা এক দেশী সাহেব।

এমন সময় সদলবলে হ্যারিসন সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে সদরঘাটে হাজির।

দু-তিন মিনিট পরে লঞ্চ থেকে একজন খালাসী বিড়ি টানতে টানতে বেরিয়ে আসতেই বোরখা পরা বিবিজানকে নিয়ে মিঁয়াসাহেব ট্রাঙ্ক মাথায় করে পশ্চিম দিকে এগুতে শুরু করল।

ফলওয়ালা ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বরিশালের স্টীমারে যাবার জন্য উঠল।

ঝগড়া শেষ করে দেশীসাহেবও ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন।

মিনিটখানেক পর চাঁদপুরের লঞ্চের কাছেই খুলনার যে স্টীমার দাঁড়িয়ে ছিল তার সামনে ঐ খালাসীর সঙ্গে একদল লোকের এমন মারামারি আর হৈ-হুলোড় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল যে সারা সদরঘাট চমকে উঠল। সবাই ঐদিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ দৌড়াদৌড়ি শুরু হতেই—গুড়ুম্, গুড়ুম গুড়ুম—

স্টীমারের ওপর থেকে ঠিক পাকা আমের মত টুপ করে হ্যারিসন সাহেবের প্রাণহীন দেহ বুড়ীগঙ্গার জলে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবের আর্তনাদ আর পুলিশের দৌড়াদৌড়ি।

প্রায় চোখের নিমেষে পুলিশ লাঠিপেটা করতে করতে আশপাশের শ'পাঁচেক লোককে গ্রেপ্তার করল।

কিন্তু ততক্ষণে সেই বোরখা পরা বিবিজান আর মিঞাভাই, ফলওয়ালা, দেশী সাহেব আর খালাসী পগার পার।

অক্ষয়দা হেসে বললেন, বোরখার মধ্যে ছিল ত্রিদিব। তলায় কালো রঙের জামা ছিল বলে বোরখার ফুটো কারুর নজরে পড়েনি। আর বোরখার ঐ ফুটো দিয়েই ও ফায়ার করেছিল।

আমরা দু-তিনজন প্রায় একসঙ্গে বললাম, তাই নাকি!

হ্যাঁ। একটু থেমে বললেন, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশ আমাদের হস্টেলে এসে হাজির—কিন্তু তখন তো আমরা যে যার ঘরে শুয়ে-বসে পড়াশুনা করছি।

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সেজেছিলেন—ফলওয়ালা?

না, আমি ঐ মিঞাভাই···

আচ্ছা! কে যেন বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

পুলিশ ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। সারারাত ধরে কত কি প্রশ্ন করল কিন্তু কিছুই বের করতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত গর্ডনসাহেব চিৎকার করে বললেন, আই থিঙ্ক বরিশালের বডমাইশরাই এই কাম করেছে।

সদানন্দ দারোগা বললেন, স্যার গণ্ডগোল শুরুই হয় খুলনার স্টীমার থেকে। মনে হয় ঐ স্টীমারে করেই ওরা এসেছিল।

ইয়েস, আই অলসো থিঙ্ক সো।

অক্ষয়দারা পরের দিন সকাল দশটায় ছাড়া পেয়ে হস্টেলে ফিরে এলেন।

এর মাসখানেক পরে আরমানীটোলার এক পুরনো গীর্জার দোরগোড়ায় এক দেশী সাহেব অন্য এক দেশী সাহেবের বুকে পিস্তল ধরেই বললেন, মানিকবাবু, হ্যাণ্ডস্ আপ্!

মানিকদা স্বপ্নেও ভাবেনি কোট-প্যান্ট পরে সদানন্দ দারোগা ইসলামপুরের দোকান থেকেই তার পিছনে পিছনে আসছে।

রজার্স সাহেবকে মারা হল না।

মানিকদাও গ্রেপ্তার হলেন কিন্তু তার আগে সদানন্দ দারোগাকে মারাত্মকভাবে আহত করলেন। আর দু'ইঞ্চি ওপরে গুলী লাগলেই সদানন্দ চিরানন্দময় অমৃতলোকে পৌঁছে যেতেন।

মানিকদার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেও পুলিশ হ্যারিসন সাহেবের হত্যাকাণ্ডের কোন খবর বের করতে পারল না।

এদিকে মাহুতটুলীর ঐ কবিরাজের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দু'পকেটে দুটি পিস্তল সমতে ত্রিদিব গ্রেপ্তার হল।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়দা, নীলমনি ও আরো চার-পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল।

মামলা শুরু হল।

চললও অনেক দিন ধরে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না।

তবে সদানন্দ দারোগাকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে মানিকদার সাত বছর জেল হল।

আর্মস এ্যাক্টে ত্রিদিবের জেল হল দু'বছর। ছাড়া পেলেন নীলমনি ও অক্ষয়দা।

বিচারে মুক্তি পেলেও ওঁদের দুজনকেই ঢাকা জেলার বাইরে চলে যাবার আদেশ দিল পুলিশ।

অক্ষয়দা কেষ্টদার দিকে একটু হেসে বললেন, কি আর করব, চলে এলাম চাঁদপুরে।

সেখানে কে ছিলেন ?

খোকনদার এক দূর সম্পর্কের ভাই মুরারি উকিলের বাড়িতে উঠলাম।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন, উনিও কী তোমাদের দলে ছিলেন ?

না না। অত সাহস ওর ছিল না। তবে টুকটাক সাহায্য করতেন। আসল কথা, ওর তেমন প্র্যাকটিশ না থাকলেও বেশ কিছু জমিজমা ছিল আর বাড়িটাও বিরাট ছিল।

তাছাড়া নেহাত গোবেচারা ভদ্রলোক হিসেবে মুরারিবাবুর খ্যাতি

ছিল চাঁদপুর শহরে। সংসার চালাবার চিন্তাভাবনা ছিল না বলে খুব সামান্য টাকা-পয়সার বিনিময়েই মক্কেলদের মামলা করতেন। তাই মুরারিবাবুর বাড়িতে দিনরাত্তির মক্কেলদের ভীড় লেগেই থাকত। আর ঐ মক্কেল আর কোর্ট-কাছারি নিয়েই উনি ভোরবেলা থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন।

পিতৃকূলের কেউ সেখানে না থাকলেও মুরারিবাবুর বৃদ্ধ বাতগ্রস্ত শ্বশুরমশাই বাবাজীবনের স্থায়ী অতিথি ছিলেন।

ভদ্রলোক কলকাতায় বার্ড কোম্পানির সেবা করে বহু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি করেছিলেন এবং মুরারিবাবুর স্ত্রীই ছিলেন তার প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেও তিনি দীর্ঘকাল আগেই স্বর্গারোহন করেন।

তারও গর্ভে একমাত্র কন্যা। নাম মলিনা। সেও দিদি-জামাইবাবুর আশ্রয়ে ছিল।

মুরারিবাবুর স্ত্রী স্বামীকে দু'বেলা খেতে দেওয়া ছাড়া সব সময়ই পিতৃসেবায় ব্যস্ত। সেটা পিতৃভক্তি না সম্পত্তির লোভে তা ঈশ্বরই জানেন।

মজার কথা মুরারিবাবুরও একটি কন্যা। তার বয়েস মোটে ছয়-সাত।

সংসার চালান মুরারিবাবুর পিসীমার এক জা। বালবিধবা। বয়সও যথেষ্ট হয়েছে! তবে কাজকর্মে অত্যন্ত পটিয়সী। সংসারের সবকিছু ঐ বুড়ীর নখদর্পণে। সংসার চলেও শুধু ওরই জন্য। সব মিলিয়ে সংসারটি বেশ বিচিত্র।

এ সংসারে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই ঠিকই কিন্তু ভালবাসা বা আনন্দের মাধুর্যও কেউ যেন পায় না।

মালপত্র বারান্দায় রেখে অক্ষয়দা মুরারিবাবুর চেম্বারে ঢুকতেই উনি বললেন, এসো, এসো।

সসম্ভ্রমে অক্ষয়দা জিজ্ঞেস করলেন, আমার সম্বন্ধে কোন খবর পেয়েছেন কী?

মুরারিবাবু হেসে বললেন, সব খবর পেয়েছি। চিন্তার কিছু নেই। মহানন্দে খাও-দাও আর পড়াশুনা কর।

উনি মক্কেলদের একটু বসিয়ে রেখে ওকে নিয়ে স্ত্রীর সামনে হাজির করে বললেন, এই যে অক্ষয় এসে গেছে। ওর সব ব্যবস্থা করে রেখেছ তো?

মুরারিবাবুর স্ত্রী হেসে বললেন, ব্যবস্থা আবার কী? বাড়ির ছেলে থাকবে, খাবে, পড়াশুনা করবে।

মুখে কিছু না বললেও একতলার পুবদিকের বারান্দার পাশে যে তিনখানা ঘর সারা বছর তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে, তার একখানি ঘরে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন।

ও সারদা, সারদা বলে দু-তিনবার ডাকতেই এক বুড়ী চাবির গোছা নিয়ে সামনে এলে উনি বললেন, কতক্ষণ ধরে চাবির জন্য ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকবে বল তো? এত চিৎকার করছি, তবু কী কানে কিছু পৌঁছয় না?

বৃদ্ধা সারদা কোন কথা না বলে ঘরের দরজা খুলে দিল।

একবার চাঁপা পিসীকে ডেকে দে।

সারদা চলে যাওয়ার একটু পরেই চাঁপা পিসী ঘরের মধ্যে পা দিয়ে বললেন, স্বদেশী ছেলে এসে গেছে?

অক্ষয়দা হাসলেন।

মুরারিবাবুর স্ত্রী বললেন, ইচ্ছে থাকলেও আমার তো সময় নেই। তুমি ওকে দেখ।

চাঁপা পিসী হেসে বললেন, ও তো আগেও এসেছে। কিচ্ছু চিন্তার নেই।

অক্ষয়দার দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে কাটে। সারদার মত কোন বুড়ী ঝি সকালে এসে ঘর-দোর পরিষ্কার করে। তার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কেউ না কেউ জলখাবার দিয়ে যায়।

মুরারিবাবু কোর্টে বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই সারদা ঘোমটা টেনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, রান্না হয়ে গেছে। যখন ইচ্ছে খেতে আসবেন।

বিকেলে যথাসময়ে জলখাবার ঘরে বসেই পাওয়া যায়। খুব ভোরবেলা থেকে সংসারের কাজকর্ম শুরু হয় বলে এ বাড়িতে নৈশভোজের পর্ব একটু তাড়াতাড়িই মিটিয়ে দেওয়া হয়। অক্ষয়দার অত সকাল খাওয়া অভ্যাস নেই বলে চাঁপা পিসী ওর খাবার ঘরে পাঠিয়ে দেন।

একজন ঝি এসে জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে মেঝে মুছে আসন বিছিয়ে দেবার পরই অন্য একজন খাবার-দাবার রেখে যায় ঢাকা দিয়ে।

থালার পাশে এক গেলাস জল ছাড়া একটা বড় ঘটিতে খাবার জলও রেখে যায়।

অক্ষয়দা রোজ সন্ধ্যের পর একবার মুরারিবাবুকে দেখা দেন, কিন্তু মক্কেল পরিবৃত থাকার জন্য উনি শুধু একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, কী কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না না, অসুবিধে হবে কেন?

বাস! মুরারিবাবু আবার ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড এবং সি. আর. পি. সি'র অরণ্যে হারিয়ে যান।

মুরারিবাবুর সঙ্গে তবু রোজ দেখা হয় কিন্তু ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কদাচিৎ কখনও খাবার ঘরে যাতায়াতের সময় বা বড় দালানের পাশ দিয়ে সদরের দিকে যাবার সময় মুহূর্তের জন্য ছাড়া দেখা হয় না।

কি বৌদি, ভাল তো?

আমি তো ভাল কিন্তু বাবার কাজকর্ম করে এক মুহূর্ত সময় পাই না যে তোমার সঙ্গে কথা বলব। ঐ কথা বলতে বলতেই উনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যান।

প্রায় রোজই একবার কোন না কোন সময়ে মলিনার সঙ্গে দেখা হয়

ও আড় চোখে অক্ষয়দাকে দেখেই চলে যায়। কোন কথা বলে না।

মলিনার বিয়ের বয়স বহু দিন পার হয়ে গেছে কিন্তু তবু তখনো পড়াশুনা করছে।

মাস খানেক এমনি ভাবেই কেটে গেল।

সেদিনও বড় দালানের সিঁড়ির মুখে অক্ষয়দায় সঙ্গে মুরারিবাবুর স্ত্রীর দেখা। উনি কি যেন হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠছিলেন। অক্ষয়দাকে দেখে বললেন, রোজই ভাবি তোমাকে একটা কথা বলব কিন্তু আর হয়ে ওঠে না। তুমি তো বাপু লেখাপড়ায় খুব ভাল। তা ভাই আমার বোনের পড়াশুনা একটু যদি দেখিয়ে দাও তাহলে হয়তো ও এবারে উতরে যাবে।

নিশ্চয়ই দেখিয়ে দোব।

মুরারিবাবুর স্ত্রী এক ধাপ কাছে এগিয়ে এসে একটু চাপা গলায় বললেন, সোমত্ত মেয়ে। বাইরের মাস্টারকে তো বাড়ির মধ্যে আনতে পারি না।

কি বলবেন অক্ষয়দা, চুপ করে থাকলেন।

খানিক চুপ করে থেকে উনিই আবার বললেন, তাহলে মলিনাকে যেতে বলব, কেমন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন সুবিধে হয় আসতে বলবেন।

মেয়েদের বয়স সম্পর্কে অক্ষয়দার কোন ধ্যান-ধারণা না থাকলেও প্রথম দিন মলিনাকে দেখেই মনে হল, ও তাঁর চেয়ে দু-এক বছরের বড় না হলেও নিশ্চয়ই সমবয়সী। এই বয়সে স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দেওয়া বিস্ময়কর কিন্তু অক্ষয়দা কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

মলিনা কখনও সকালে, কখনও বিকেলে আবার কখনও দুপুরেও আসে। বলে, দুপুরে দিদি একটু বিশ্রাম করে। তাই ওই সময় আমি বাবার কাছে বসি।

তোমার বাবার কী অসুখ করেছে ?

বাবার নানা রকম অসুখ। মলিনা বলে, আমি তো জন্ম থেকেই শুনে আসছি বাবার শরীর খারাপ।

তবে বাবার বয়সও তো হয়েছে।

হ্যাঁ, এখন চুয়াত্তর।

তোমার দিদি ওর খুব সেবা করেন।

বাবা যে দিদিকে খুব ভালবাসেন।

কথাটার মধ্যে একটা চাপা অভিমানের ইঙ্গিত পেলেন অক্ষয়দা। বললেন, শুধু দিদিকে কেন, তোমাকেও তো ভালবাসেন।

হ্যাঁ, তা ভালবাসেন বৈকি, তবে দিদিকে অনেক বেশী ভালবাসেন।

এ বাড়ির দোতলায় তিনটি ঘর। একটিতে মুরারিবাবু থাকেন, অন্যটিতে ওঁর ওই বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই। তৃতীয়টি ঠাকুর ঘর। গুরুদেব এলে ঐ ঠাকুরঘরেই থাকেন। মলিনা থাকে পশ্চিমের দিকের বারান্দার ঠিক পাশের ঘরে।

মুরারিবাবু আগে এই ঘরেই থাকতেন। ওর বাবা মারা যাবার পর উনি ওপরের ঘরে চলে যান। মলিনার ঘরের পাশেই চাঁপা পিসীর ঘর। বাড়ির আর সবাই ভিতরের দিকের ঘরে থাকে।

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম গল্প-গুজবও হয়। হঠাৎ একদিন কথায় কথায় মলিনা বলল, আমি আপনাকে যত দেখি তত অবাক হয়ে যাই। ভাবতেই পারি না সাহেবরা পর্যন্ত আপনাকে ভয় করে।

অক্ষয়দা হাসেন। বলেন, না, না, আমাকে কেন ওরা ভয় করবে?

মলিনা হেসে বলল, লুকোচ্ছেন কেন? আমি সব জানি। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা এভাবে বড় বড় সাহেবদের মারলে কি ওরা সত্যি এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

একদিকে আমাদের মত কিছু পাগল ছেলেমেয়ে আর অন্যদিকে গান্ধীজী যা শুরু করেছেন, তাতে ওরা ঘাবড়ে গেছে। অক্ষয়দা বলেন, ইংরেজদের এ দেশ ছাড়তেই হবে, দু'দিন আগে বা পরে।

আস্তে আস্তে দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ফলে মলিনা এখন পড়েই চলে যায় না। নানা রকম গল্পও করে।

সেদিন ভোর থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধ্যের পর বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হল। মলিনা খেয়েদেয়ে অক্ষয়দার ঘরে এলো।

কী হল? শুতে গেলে না?

আমি কী চাঁপা পিসীর মত পরিশ্রম করি যে খাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে লুটিয়ে পড়ব?

উনি খুব পরিশ্রম করেন, তাই না?

গরীবের ঘরের বিধবা। পরিশ্রম না করলে খেতে দেবে কে।

অক্ষয়দা চুপ করে যান।

কথায় কথায় সময় গড়িয়ে চলে। পাশের দালানের জাপানী দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই অক্ষয়দা বলেন, চাঁপা পিসী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লেন।...

পড়লেন মানে? চাঁপা পিসীর এখন মাঝরাত্তির।

আর সবাই?

রান্নাঘর পরিষ্কার করে সারদা ভিতরে না গেলে চাঁপা পিসী শুতে যান না।

হঠাৎ এই সময় খুব জোরে বিদ্যুত চমকে মেঘ ডাকতেই মলিনা ভয় পেয়ে অক্ষয়দাকে জড়িয়ে ধরল।

বৃদ্ধ অক্ষয়দা হেসে কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ভালই যে লেগেছিল তখন তা বলে বোঝাতে পারব না।

কেষ্টদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর?

তারপর আর কি, সারা রাত মলিনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শুয়ে রইলাম।

আমরা ছেলে ছোকরারা অবাক। নিত্যানন্দদা কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, শুধু জড়িয়েই শুয়ে থাকলে?

ওরে বাপু, আমি কি রক্ত-মাংসের মানুষ না ? তোমরা ঐ অবস্থায় পড়লে যা করতে, আমিও ঠিক তাই করেছি।

আমরা মুখ টিপে টিপে হাসি।

অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?

আমরা চুপ করে থাকি।

নিত্যানন্দদা চুপ করে থাকেন না। প্রশ্ন করেন, তা এই অপকর্ম কতদিন চলেছিল ?

প্রায় মাস ছয়েক !

চমৎকার !

অক্ষয়দা হেসে বলেন, ওরে শালা, সুযোগ পেলে কেউ ছেড়ে দেয় না। এই টিকিওয়ালা কেষ্ট পণ্ডিতও যদি সুযোগ পায় তাহলে ভূতের কেত্তন দেখিয়ে ছাড়বে।

কেষ্টদা প্রতিবাদ না করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, ছ মাস পর কী হল ?

আমি পরীক্ষা দিতে ঢাকা এলাম। তারপর ঢাকা থেকে আবার এক্সটার্ণের অর্ডার হতেই আমরা ক'জন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলাম।

মলিনা চিঠি লিখত ?

না রে বাপু, অত সাহস তখনকার মেয়েদের ছিল না। তবে আমিই দু-একখানা চিঠি দিয়েছি।

জবাব দেয়নি ?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় আলিপুর জেলে থাকার সময় একটা চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু সেন্সরে এত কাটাকুটি করেছিল যে সে চিঠির কোন মাথামুণ্ডু হয় না।

নিত্যানন্দদা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর আবার কবে আমাদের মলিনাবৌদির সঙ্গে দেখা হয় ?

ওর প্রশ্নে আমরা হেসে উঠি।

অক্ষয়দা গম্ভীর হয়ে বললেন, না, আর দেখা হয়নি। বছর চারেক পরে একদিনের জন্য চাঁদপুরে গিয়ে জানতে পরলাম, মাস ছয়েক আগে সে আত্মহত্যা করেছে। আর জানতে পারলাম, পনেরো বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়েছিল। আঠারোতেই বিধবা হয়।

কেষ্টদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে স্বর্গে থাক কিন্তু তুমি শালা একে ভদ্দরলোক, তার ওপর বিপ্লবী হয়েও এ সব অপকর্ম করতে দ্বিধা হল না তোমার ?

চুপ কর শালা। বেশী ভদ্দরলোকী আর বিপ্লবী দেখাস না। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। সবাই কি সি. আর. দাস না সুভাষবাবু ? নাকি সবাই বারীন ঘোষ, সূর্য সেন ?

আমরা বোবা।

অক্ষয়দা দম নিয়ে বলেন, এ জীবনে অনেক ভদ্দরলোক দেখলাম। কোচা-কাছা নাড়লে অনেক ভদ্দরলোকেরই অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যাবে। বলতে শুরু করলে কত সংসারে যে আগুন লাগবে তা ভাবতে পারবি না।

সে এক বিচিত্র বয়স আমার।

অনেকটা কাঁচামিঠে আমের মত।

দেহ বলছে, শৈশব-কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছি, মন বলছে, আমি যৌবনের স্বপ্নলোকের বাসিন্দা।

কখনও মন এগিয়ে যায়, কখনও দেহ। মন বলছে, সব জানি, সব বুঝি কিন্তু দেহ বলে, না, এখনও অনেক কিছুই জানি না, বুঝি না।

আবার কখনও কখনও মনের তাগিদে ছেলেমানুষী করি কিন্তু দেহ সায় দেয় না।

দেহ যখন বিদ্রোহ করে মন পিছিয়ে যায়।

আমার জীবনে এমনি রোদ-বৃষ্টির খেলার সময়ই আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার হলাম।

শৈশবের পবিত্রতা ও কৈশোরের স্বপ্নমাখা মন তখনও হারিয়ে যায় নি।

বাস্তবের মুখোমুখি হয়েও চারদিকের পৃথিবীকে তখন সবুজ, শ্যামল, মধুময় মনে হয়।

মানুষকে দেবতা মনে করি না কিন্তু অমানুষও ভাবতে পারি না। চারপাশে যাদের দেখি, তাদের অনেককে পছন্দ না করলেও ঘেন্না করি না।

জানি, এদের কেউই বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ না কিন্তু কাউকে লম্পট বদমাইস ভাবতেও সাহস হয় না।

যারা কম-বেশী লেখাপড়া শিখে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করে, চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তারা তো সবাই ভদ্দরলোক। ছোটবেলা থেকে শুনেছি এই ভদ্দরলোকরাই স্কুলের মাস্টারমশাই, কলেজের অধ্যাপক, সরকারীকর্মচারী, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার আরো কত কি।

এক কথায় ভদ্দরলোকরাই দেশ চালায়, সমাজের মাথা।

আবার কিছু আদর্শবান ভদ্দরলোক রাজনীতি করেন। এরা নিজেদের জীবন, যৌবন, স্বার্থ তুচ্ছ করে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আমি মনে মনে এদের শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি।

যে কৈশোরের স্বপ্নভরা দিনগুলিতে শুধু মহাপুরুষদের জীবনী পড়েছি, সে এদের শ্রদ্ধা-ভক্তি না করে পারে?

অক্ষয়দার গল্প শুনে সেই প্রথম হোঁচট খেলাম।

আমার স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখে সন্দেহের ছানি পড়তে শুরু করল। সেই প্রথম মনে সন্দেহের মেঘ দেখা দিল।

মাঝে মাঝে অক্ষয়দার ওপর খুব রাগ হত। ভাবতাম, উনি খারাপ হয়েছেন বলে কি অন্য ভদ্দরলোকদেরও খারাপ হতে হবে? সি. আর. দাশ, সুভাষচন্দ্র, বারীন ঘোষ, সূর্য সেন যে ভাল, এ কথা বাংলাদেশের প্রত্যেক শিশুও জানে।

অক্ষয়দার সার্টিফিকেটের জন্যই ওদের আমি শ্রদ্ধা-ভক্তি করি না। কেউ করবে না।

ওঁরা স্ব-মহিমায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

তাই বলে ওঁরা ছাড়া কি আর কেউ ভাল না?

এ সংসারে কে ভাল, কে মন্দ, ভাবতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে

ফেলি। অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না।

অক্ষয়দার মুখে মল্লিনার কাহিনী শুনলাম। শোনার সময় বেশ উপভোগ করলেও পরে ওঁর প্রতি মনটা কেমন বিরূপ হয়ে গেল।

কয়েকদিন নিউজ-এর ঘরেই ঢুকলাম না।

কদিন পর আবার নিউজের ঘরে যাতায়াত শুরু করলাম। কেমন সয়ে উঠলাম।

মনে মনে অনেক যুক্তি-তর্ক করার পরও অক্ষয়দাকে কিছুতেই খারাপ ভাবতে পারছিলাম না।

ওঁর পাণ্ডিত্য, আদর্শ, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্পষ্টবাদিতা, মানুষের প্রতি মমত্ব ছাড়াও সর্বোপরি ওঁর সত্যবাদিতা আমাকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বুঝলাম, কিছু লেখাপড়া শিখে কোট-প্যান্ট বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অফিস-আদালতে চাকরি-বাকরি করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করলেই সত্যিকার ভদ্দরলোক হওয়া যায় না।

আর জানলাম, যারা স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, ইংরেজের কারাগারে বন্দী থেকেছেন, তাঁরা সকলেই দেবতা নন। তাঁরাও পঞ্চভূতে তৈরি, ষড়রিপুর অধিকারী।

ওরে কেষ্ট, গোমস্তার ব্যাটা যে এ্যাম্বাসাডর হয়ে গেল। টেলিপ্রিন্টারের কপির ওপর চোখ বুলাতে বুলাতেই অক্ষয়দা বলে উঠলেন।

প্রুফ দেখা বন্ধ রেখে কেষ্টদা নিকেলের ফ্রেমের চশমা নাকের ওপর তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, কে আবার গোমস্তার ব্যাটা?

কুমার রজনীকান্ত চৌধুরী।

কোন্ কুমার রজনীকান্ত? রাজা নীলকান্তর ছেলে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার কে?

ও আবার গোমস্তার ব্যাটা হল কি করে?

তুই শালা কুমারসম্ভব আর শকুন্তলার রস চেটে জীবন কাটিয়েছিস বলে এ খবর রাখারও সময় পাসনি। অক্ষয়দা হেসে বললেন, নোয়াখালির রাজা নীলকান্তর ট্রাজেডির খবর কে না জানে?

কেষ্টদা বুঝলেন, অক্ষয়দা যখন মুখ খুলেছেন তখন কিছু বেরুবে এবং তা চট করে শেষ হবে না। তাই কলম নামিয়ে রেখে বললেন, সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না।

কিছুই জানিস না?

শুধু জানি, রাজা নীলকান্ত বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, উনি যেমন গান-বাজনার সমঝদার ছিলেন, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

আর কিছু?

কেষ্টদা একটু ভেবে বললেন, আর কিছু মানে বড় বড় ওস্তাদ ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং দিল্লী-লক্ষ্ণৌ-কাশ্মীর থেকে বড় বড় ওস্তাদ নোয়াখালি যেতেন জানি। তাছাড়া—

কেষ্টদা স্মৃতিশক্তি রোমন্থন করে আবার বললেন, বাংলাদেশের বহু টোলের উনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রতি বছর নোয়াখালির রাজবাড়িতে পণ্ডিতসভা হত। কেষ্টদা থামলেন।

ব্যস! রানীমার বিষয়ে কিছু জানিস না?

কেষ্টদা মাথা নেড়ে বললেন, না।

অক্ষয়দা একটু ব্যঙ্গ হেসে বললেন, রাজা নীলকান্ত শুধু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমঝদার বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, নিজেও বড় ওস্তাদ ছিলেন। আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন বলেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের এত সম্মান করতেন। কিন্তু···

উনি একটু থেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি গান-বাজনা নিয়ে থাকতেন আর রানীমা থাকতেন জগদানন্দ গোমস্তাকে নিয়ে।

আরে দূর!

ওরে বাপু, যা বলছি শুনে রাখ। এই রজনীকান্ত-টান্ত সবাই ঐ জগদানন্দর মালমশলায় তৈরি।

কী যা-তা বলছ! কেষ্টদা বেশ রেগেই বললেন, তুমি বড়লোকদের কেচ্ছা রটাবার গুরুদেব। বহু বছর খবরের কাগজে কাজ করছ বলে কি যার নামে যা বলবে, তাই সত্যি হয়ে যাবে?

অক্ষয়দা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বললেন, এই শর্মা অযথা কারুর প্রশংসাও করে না, নিন্দাও করে না। আমি প্রিভি কাউন্সিলের প্রসিডিংস এনে দেখিয়ে দেব!

কেষ্টদা তর্ক করে এমন একটা রসের আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়ায় আমরা সবাই মনে মনে আহত হলেও নিরুপায়। কাকে কি বলব? চুপ করে যে যার কাজে চলে গেলাম।

পরের দিন অক্ষয়দা অফিসে না আসায় সবাই অবাক। শরীর খারাপ হল নাকি? হাজার হোক বয়স হয়েছে। এখন হঠাৎ অসুস্থ হওয়া বিচিত্র নয়।

অক্ষয়দা বিয়ে করেননি। ভাইপোর কাছেই থাকতেন। নিত্যানন্দদার কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর নিয়ে সম্পাদক মশাই নিজেই টেলিফোন করলেন।

জানা গেল, অক্ষয়দা ভালই আছেন। তবে আজ একটু বিশেষ জরুরী কাজে ব্যস্ত বলে অফিসে আসতে পারবেন না।

আমরা কেউ কোন সন্দেহ না করলেও কেষ্টদা মুখ টিপে হাসতে হাসতে ঘোষণা করলেন, আসলে শালা ভাবেনি আমি এমন করে চেপে ধরব।

আমরা কেউ কিছু বলি না। কী বলব?

কেষ্টদাই আবার বলেন, অক্ষয় আর চট করে অফিসে আসছে না। শুধু আজ না, এখন বেশ কিছু দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকবে, দেখে নিও।

কিন্তু না, পরের দিন ওয়েস্ট এণ্ড কোম্পানির গোল বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে তিনটে বাজতেই অক্ষয়দা অফিসে ঢুকলেন। বসলেন। প্রতিদিনের মত একগাদা বইপত্তর টেবিলের এক পাশে রেখে এক গেলাস জল খেলেন।

তারপর নিউজ ডায়েরীর ওপর একবার চোখ বুলিয়েই টেলিপ্রিন্টারের কপিগুলো দেখতে শুরু করলেন।

কেষ্টদা শব্দকোষের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। অন্যান্যরা টুকটাক কাজে ব্যস্ত।

আমরা দু-তিনজন রিপোর্টার পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আড়চোখে অক্ষয়দাকে দেখছিলাম। সারা ঘরের আবহাওয়া বেশ থমথমে।

ঝড় উঠবে, না বৃষ্টিতে ভেসে যাবে, তা কেই বুঝতে পারছিলেন না। এক কথায় সব মিলিয়ে বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

হঠাৎ অক্ষয়দা মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, কি রে কেষ্ট, কেমন আছিস ?

ভাল। তুমি ?

আমি সব সময়ই ভাল থাকি।

এতক্ষণ যেন আমরা কেউ ভাল করে নিশ্বাসই নিতে পারছিলাম না। দুই বন্ধুর কথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কেষ্টদা একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, কাল কী হয়েছিল ?

একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কেন ? কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি ?

না, না, কোন গণ্ডগোল হয়নি।

এবার নিত্যানন্দদার দিকে তাকিয়ে অক্ষয়দা জিজ্ঞেস করলেন, কাল নাইটে কে কে ছিল ?

আমি আর নিখিল।

নিউজের ট্রিটমেণ্ট খুব ভাল হয়েছে। শুধু সুপ্রীম কোর্টের জাজমেণ্টটা আরো বড় করে দিলে ভাল হত।

নিত্যানন্দদা বললেন, হ্যাঁ. ওই খবরটা অত ছোট করে দেওয়া উচিত হয়নি। অন্য সব কাগজেই ওটা খুব ভাল করে ছেপেছে।

আস্তে আস্তে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এলেও আসল নাটক শুরু হচ্ছে না দেখে আমরা হতাশ হয়ে পড়ছিলাম।

নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ লাল চামড়ার বাঁধাই করা একটা বই নিত্যানন্দদার দিকে এগিয়ে দিয়ে অক্ষয়দা বললেন, দেখ তো নিত্যানন্দ, এটা কি বই ?

নিতানন্দদা বইটির মলাট উল্টে বললেন, জুডিসিয়াল রিভিউ অব নোয়াখালি এস্টেট এ্যাফেয়ার্স বাই প্রিভি কাউন্সিল, লণ্ডন।

কেষ্ট, শুনেছিস ?

শুনব না কেন ?

অক্ষয়দা বইটা নিজের হাতে নিয়ে সূচীপত্র দেখতে দেখতে বললেন, ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আছে গভর্ণর অব বেঙ্গলের গোপন রিপোর্ট। তারপর আছে ভারত সরকারের রিপোর্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতামত। সব শেষে প্রিভি কাউন্সিলের মতামত।

আমরা সবাই চুপ। কেষ্টদাও নীরব হয়ে আপন মনে বিড়ি টানছিলেন।

অক্ষয়দা বললেন, গভর্ণরের গোপন রিপোর্টটা অনুবাদ করে ছাপিয়ে দিলে একটা চমৎকার বাংলা উপন্যাস হয়।

তারপর এক ঢোক জল খেয়ে চশমাটা ঠিক করে অভয়দা বললেন, কেষ্ট, তাহলে শোন।···

পলাশীর যুদ্ধের সময় লর্ড ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যাপারে কিছু স্থানীয় নেটিভ অশেষ সাহায্য করে। এদেরই একজন বাবু নিশিকান্ত সরকার।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরও নিশিকান্ত নানাভাবে কোম্পানির সৈন্যবাহিনী ও কর্মচারীদের সাহায্য করেন।

প্রকৃতপক্ষে নিশিকান্তর মত নেটিভদের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে কোম্পানির পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এত সহজে আধিপত্য বিস্তার করা আদৌ সম্ভব হত না।

বাবু নিশিকান্ত সরকারের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান শহরের কাছে কিন্তু প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন কলকাতার উপকণ্ঠে। যাই হোক, নিজের চারিত্রিক মাধুর্যে ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য উনি বহু দায়িত্বশীল ইংরেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় হয়ে ওঠেন।

এইভাবে কিছুকাল কাটার পর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হয়ে এদেশে এলেন।

গভর্ণর জেনারেল হলেও কাউন্সিলের চারজনের তিনজন সদস্যই হেস্টিংস-এর বিপক্ষে ছিলেন এবং দু-এক সদস্যের মৃত্যুতে তিনি কর্তৃত্ব ফিরে পেলেও ফ্রান্সিসের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন না।

তার অবশ্য অনেক কারণ ছিল।

সে সময় চুঁচুড়ার ডাচ গভর্ণর ছিলেন হেস্টিংস-এর পুরানো বন্ধু রস। তাই তিনি মাঝে মাঝেই চুঁচুড়ায় রসের কাছে যেতেন।

চুঁচুড়ায় যাবার ব্যাপারে হেস্টিংস-পত্নী ম্যারিয়ান আদৌ উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু তবু প্রায়ই যেতে হত।

ম্যারিয়ান অত্যন্ত সুন্দরী ও প্রাণচঞ্চলা ছিলেন। এক জার্মান ব্যারনের সঙ্গে তার বিয়েও হয়েছিল। ব্যারন হলেও উনি অতি সাধারণ ডাক্তার ছিলেন।

নিজের দেশে দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ওরা ভাগ্যের সন্ধানে ভারতবর্ষ আসছিলেন। ঐ একই জাহাজে আসছিলেন বিপত্নীক হেস্টিংস। ম্যারিয়ানের রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন।

আলিপুর বেলভেডিয়ারে থাকার সময় ফ্রান্সিসের সঙ্গে প্রথমে আলাপ, পরে বন্ধুত্ব হয় ম্যারিয়ানের।

একবার চুঁচুড়ায় ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংস-এর দারুণ লড়াই হয় এবং ফ্রান্সিস গুরুতর আহত হয়ে ফিরে যান।

নাটকের পর নাটক।

মহারাজ নন্দকুমার বললেন, হেস্টিংস মনিবেগমের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছেন।

হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলেন।

কোথা থেকে উড়ে এসে এক অজ্ঞাত মোহনপ্রসাদ মামলা করল, নন্দকুমার জালিয়াতি করেছে। বিচারকের আসনে বসলেন হেস্টিংস-এর বাল্যবন্ধু ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে। বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসী হল।

শোনা যায় এই নাটকে বাবু নিশিকান্ত সরকার নেপথ্যে থেকে হেস্টিংসকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

ওদিকে ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধে হারিয়ে আমেরিকা স্বাধীন হল।

ক'বছর পর ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে।

আর ভারতবর্ষে? লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার জন্ম দিলেন এবং বাবু নিশিকান্ত সরকার হয়ে গেলেন জমিদার নিশিকান্ত চৌধুরী।

নিশিকান্ত চৌধুরীর উপযুক্ত পৌত্র বরদাকান্ত দিল্লীর দরবার থেকে ফিরলেন রাজা উপাধি নিয়ে কিন্তু অল্প বয়স থেকেই তিনি এমন অসম্ভব ব্যভিচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন যে পরিপূর্ণ যৌবনে সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার ছিল না।

রাজা বরদাকান্তর দত্তক পুত্রেরই নাম হল রাজা নীলকান্ত চৌধুরী।

এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন রাজা নীলকান্ত। নারী নয়, সুরা, নয়, সঙ্গীত আর সাহিত্য নিয়েই তিনি মশগুল থাকতেন দিনরাত। জমিদারীর ব্যাপারে কোন উৎসাহ তার ছিল না।

বৃদ্ধা মা আর ম্যানেজার রায়বাহাদুর কেশব বাঁড়ুজ্যেই জমিদারী চালাতেন। প্রজারা অভাব-অভিযোগ নিয়ে কোন সময় তার কাছে এলেই উনি বলতেন, আমি জমিদার বাড়িতে থাকি, গান-বাজনা করি,

একটু-আধটু পড়াশুনা করি—কিন্তু আমি জমিদার না। তোমরা মাকে বল।

রানীমার কাছে যাবার সাহস ওদের ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত রায়বাহাদুরকেই ডেকে পাঠাতেন রাজা নীলকান্ত।

প্রবীণ ম্যানেজার রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করতেন, তুমি আমাকে ডেকেছ?

হ্যাঁ কাকাবাবু, এই লোকগুলো এমন দুঃখের কথা বলে যে আমি শান্তিতে গান-বাজনা করতে পারি না।

রায়বাহাদুর নীলকান্তকে পুত্রের মতই স্নেহ করতেন। তাই উনি হেসে জবাব দিতেন, ওদের কাজ আমি করে দিচ্ছি। তুমি গান-বাজনা নিয়েই থাকো। কিন্তু নীলকান্ত, আমি তো বুড়ো হয়েছি। রানীমারও তো অনেক বয়স হল। তুমি যদি একটু-আধটু জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশুনা শুরু না কর—

ও সব পরে ভাবা যাবে।

হৃদয়পুরের জমিদার বাড়ির মেয়ে পুষ্পলতার সঙ্গে নীলকান্তর বিয়ে হয়েছিল।

পুষ্পলতা শুধু অপরূপ সুন্দরীই ছিলেন না, ঘরে বসে মেমসাহেবের কাছে লেখাপড়াও শিখেছিলেন। বছরের ন'মাসই কলকাতায় থাকতেন। বাকি তিন মাস বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন হৃদয়পুর, দার্জিলিং, সিমলা, শিলং—আরো কত জায়গা।

গড় গড় করে ইংরেজি বলতে পারতেন তিনি, সোনার মেডেল পেয়েছেন ব্যাডমিন্টন খেলে।

নীলকান্ত-জননী ভেবেছিলেন, এ মেয়ে নিশ্চয়ই ছেলের মন ফেরাবে। আর ভেবেছিলেন, প্রয়োজনে এ মেয়ে জমিদারীও চালাতে পারবে।

বৃদ্ধা রানীমা দুর্গামণির প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়েছিল—

অক্ষয়দা একটু থামলেন। জল খেলেন। তারপর কেষ্টদাকে বললেন, এবার একটু মন দিয়ে শুনিস। আর যখনই মনে হবে আমি বানিয়ে বানিয়ে কেচ্ছা বলছি, তখনই থামতে বলবি। আমি সঙ্গে সঙ্গে তোকে বইটা খুলে দেখিয়ে দেব।

কেষ্টদা হেসে বললেন, আর ন্যাকামী না করে পড়ে যাও। সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং।

আমরা দু'তিনজন সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং।

অক্ষয়দা আমাদের দিকে তাকিয়ে রহস্যের হাসি হেসে বললেন, পাতে সবে সুক্তো পড়েছে। এখনও ডাল-তরকারী মাছ-মাংস চাটনী-মিষ্টি সবই বাকি আছে।

বলে অক্ষয়দা আবার গভর্ণরের গোপন রিপোর্ট পড়তে শুরু করেন।

বিয়ের পর নানা উৎসব আর আনন্দের মধ্যেই দু-তিনটে মাস কেটে গেল। এই উৎসব আর আনন্দের জোয়ার কেটে যাবার পর একদিন ভোরবেলায় রাজা নীলকান্ত আবার হাতে তুলে নিলেন তানপুরা। কল্যাণ ঠাটে হিন্দোল রাগ দিয়েই যাত্রা শুরু করলেন।

গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন রাজা নীলকান্ত। তারপর গান থামল, চোখ খুললেন।

পুষ্পলতাকে দরজার কোণায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে, আনন্দে ঝলমল করে উঠলেন। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গান শুনছিলে?

উনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

ভোরবেলায় হিন্দোল রাগে গান গাইলে সারা মনটা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়, তাই না?

পুষ্পলতা ম্লান হেসে বললেন, একটা কথা বলব?

নিশ্চয়ই।

পদ্মদীঘির ধারে বেড়াতে যাবে?

এখন ?

এখন ছাড়া কি দুপুরে যাব ?

পুষ্প, আজ আমাকে মাফ কর। অনেক দিন পর আজ আবার তানপুরা হাতে নিয়েছি। এখন আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

রানী পুষ্পলতা কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে যান। ছন্দপতনের সেই শুরু।

রাজা নীলকান্ত ঘরে পা দিয়েই পুষ্পলতার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান দেবদারুদ্রুমানাং···

আঃ। চুপ কর।

নীলকান্ত রানীর মুখের সামনে মুখ নিয়ে আবার শুরু করেন, যে তৎক্ষীরস্রুতি সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।···

কেন বিরক্ত করছ ?

জানো কী আবৃত্তি করছি ? কালিদাসের মেঘদূত···

তোমার কালিদাস নিয়ে তুমি থাকো। আমাকে বিরক্ত কোরো না।

তুমি মেঘদূত পড়েছ ?

না।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে পড়াব। মেঘদূত পড়লে তোমার মন ভরে যাবে।

না, রাজা নীলকান্ত বহু চেষ্টা করেও রানীকে মেঘদূত পড়ে শোনাতে পারেননি।

অনেক চেষ্টা করেও কখনো সঙ্গীতের দিকে তার মন ঘোরাতে পারেননি।

সন্ধ্যার পর সঙ্গীতরসিক বন্ধুরা এলে আবার মজলিস জমে ওঠে। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, তা কেউই জানতে পারেন না।

শুদ্ধ কল্যাণে খেয়াল শেষ হতেই রাজাসাহেবের মনে হয় রাত্রির দ্বি-প্রহর শেষ। আর নয়।

মনে পড়ে পুষ্পলতার কথা। ছুটে যান শোবার ঘরে কিন্তু রানী তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

আরো ক'মাস কেটে গেল এইভাবে।

একদিন রাজাসাহেব ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রানী বললেন, শোন—

উনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, বল।

গরম পড়ল। দার্জিলিং যাবে না?

রাজাসাহেব মনে মনে ভেবেছিলেন, লক্ষ্ণৌ যাবেন। ওখানে গেলে যেমন বেড়ানো যায় তেমনি বড় বড় ওস্তাদের কাছে তালিমও নেওয়া হয়। কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারলেন না। বললেন, যাব বৈকি। তোমার বুঝি দার্জিলিং খুব ভাল লাগে?

প্রতি বছর গরমের সময় কোন না কোন পাহাড়ে বেড়াতে যাই বলেই···

ঠিক আছে, ঠিক আছে। দু-হাত দিয়ে পুষ্পলতার মুখখানা তুলে ধরে রাজাসাহেব হেসে বললেন, তোমাকে দেখলেই মনের মধ্যে নানা সুর, নানা রাগ-রাগিনী গুণ-গুণ করে ওঠে।

পুষ্পলতাও একটু হাসেন। বলেন, দার্জিলিং যাবার কথা আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারব না।

না, না, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই মাকে বলছি। তাছাড়া কাকাবাবুকে বলছি, জগদানন্দকে যেন দু-এক দিনের মধ্যেই রওনা করিয়ে দেন।

এই জমিদার বাড়িতে ঠিক কতজন কর্মচারী আছে, তা বোধ হয় কেউ জানে না।

পাইক-বরকন্দাজ, সহিস-কোচোয়ান-দারোয়ান, ঠাকুর-চাকর, দাস-দাসী ছাড়াও কাছারিতে ম্যানেজারবাবুর অফিসে কর্মচারী ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া ঢাকা, কলকাতা, মধুপুর, কাশী ও দার্জিলিঙের বাড়িতে কর্মচারীরা রয়েছে। আরো আছে নৌকোর মাঝি-মাল্লা,

মোটরগাড়ির ড্রাইভার, মেকানিক। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের মন্দিরেই বোধ হয় দশ-পনেরোজন কাজ করে।

এদের খবর কেউ রাখে না। রাখার দরকার নেই। অন্নপূর্ণার সংসারে অন্নের অভাব নেই। স্থানাভাবও নেই থাকার।

অর্থ? মাইনে? মাইনে অনেককেই দিতে হয় না, দেওয়া হয় না। জমিদারবাবুদের কৃপায় প্রায় সবাই কিছু না কিছু চাষের জমি পেয়েছে।

আর কাপড়-চোপড়? পূজার সময় আর রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা তিথিতে সবাই কাপড়-চোপড় পায়। এ ছাড়া বাড়িতে কোন উৎসব হলেও সবাই কাপড়-চোপড় পায়।

বিয়ে-পৈতে বিপদ-আপদ? রাজাবাবু বা রানীমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেই এ সব সমস্যার মোকাবিলা করে কর্মচারীরা।

বড় রাজাবাবু দিল্লীর দরবার থেকে ফেরার পর সব কর্মচারীকে একটা করে সোনার হার দিয়েছিলেন। দু-চারজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে এখনও সে হার আছে। বাকী সবাই হার ভেঙে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হয়েছে।

জগদানন্দ এদেরই একজন। তবে বিশেষ একজন। এবং তার কারণও আছে।

মধুসূদন বিদ্যানিধি তখন রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁর পুত্র নলিনী কাছারিতে চাকরি পায়।

নলিনী যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী ছিল এবং সেজন্য জমিদার-বাড়ির সবাই ওকে খুব পছন্দ করতেন।

দেশ ছিল খুলনা জেলার বাগেরহাট। সেখানেই ওর স্ত্রী-পুত্র থাকতো এবং নলিনী দু-চার মাস অন্তর ঘুরে আসত।

জমিদারবাবুরা কখনও কখনও ওকে বলেছেন, নলিনী, তুমি তোমার পরিবারকে এখানে নিয়ে এসো। রাধাকৃষ্ণের কৃপায় এখানে ওরা ভালই থাকবে।

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বলে, না, না, রাজাবাবু সে-কথা

নয়। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এলে বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের সঙ্গে যোগ থাকবে না।

রাজাবাবুরা আর কিছু বলেন নি কিন্তু হঠাৎ একদিন বাগেরহাট থেকে খবর এলো নলিনার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তখন নলিনীর কতই বা বয়স? বড়জোর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। আত্মীয়-স্বজনদের অনেকে বার বার বললেও সে আর বিয়ে করল না এবং একদিন দশ বছরের শিশু পুত্রকে নিয়ে সে বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে টাঙ্গাইল চলে এলো। এই মাতৃহীন শিশুটিই জগদানন্দ। জগদানন্দকে সবাই স্নেহ করতেন—একজন কর্মচারীর সন্তান হয়েও রাজবাড়ির সর্বত্র ছিল তার অবাধ গতি।

ও স্কুলে ভর্তি হল। দু-চার ক্লাশ পাশও করল কিন্তু তারপর থেকেই হোঁচট খেতে শুরু করল। কোন ক্লাশে দু-তিন বছরও থাকে। টেনেটুনে সেকেণ্ড ক্লাশে যখন উঠল তখন জগদানন্দর বেশ দাড়ি-গোঁফ বেরিয়ে গেছে।

বিদ্যানিধির পৌত্র পড়াশুনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর না হলেও রাজাবাবু-রানীমাদের হুকুম তামিল করার ব্যাপারে চৌকষ হয়ে উঠল। সব সময় সব কাজ অন্দরমহলের দাসদাসীদের দিয়ে হত না বলে সবাই জগদানন্দকে তলব করতেন।

শৈশবকাল থেকে আছে বলে রানীমারা ওকে যেমন পছন্দ করতেন, তেমনি স্নেহও করতেন। কারণ জগদানন্দ যেমন বিশ্বাসী ছিল, তেমনি গোপন কথা পেটের মধ্যে রাখতে পারত। ফলে অন্দরমহলের সবচাইতে বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য কর্মচারী জগদানন্দকে না দেখলে রাজাবাবু-রানীমা চোখে অন্ধকার দেখেন।

রাজা নীলকান্ত বয়সে জগদানন্দর চাইতে কিছু বড় হলেও ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করেছেন বলে ওকে অনেকটা বন্ধুর মতই মনে করতেন।

শৈশব থেকে জমিদার বাড়িতে থাকার জন্য ওর আদবকায়দাও

অনেকটা জমিদার বাড়ির ছেলের মতই ছিল। তাছাড়া জগদানন্দও বাপের মত মিষ্টভাষী ও সুদর্শন ছিল।

জগদানন্দকে আগে পাঠিয়ে দেবার কথা শুনেই পুষ্পলতা খুশি হলেন। বললেন, হ্যাঁ, ও আগে থেকে চলে গেলেই সব ঠিকঠাক থাকবে।

নীলকান্ত কোন কালেই খুব বেশী ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করেন না। দার্জিলিং-এ গিয়ে উনি তানপুরা আর বই নিয়েই সময় কাটাতেন। বিকেলের দিকে দু-এক ঘণ্টার জন্য ম্যালে ঘুরে আসতেন।

পুষ্পলতা একদিন বললেন, টাঙ্গাইল থেকে এখানে এসেছি কি ঘরের মধ্যে বসে থাকার জন্য? টাঙ্গাইলে তো দিনরাত ঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকি। এখানে কিন্তু আমি প্রাণভরে ঘুরব।

ঘুরবে বৈকি। জগদানন্দকে বোলো, ও-ই সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবে।

তুমি টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখবে তো?

অনেকবার দেখেছি। এখন আর শেষ রাত্তিরে উঠে টাইগার হিল যাবার উৎসাহ হয় না।

টাইগার হিল থেকে সানরাইজ না দেখলে দার্জিলিং আসার কোন মানে হয়?

নীলকান্ত জগদানন্দকে ডেকে বলেন, জগা, পুষ্পকে টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখার ব্যবস্থা করে দিস।

আপনি যাবেন না?

না।

শুধু টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় না, আরো কত জায়গা পুষ্পলতা জগদানন্দকে নিয়ে ঘুরলেন। লোকটি বিশেষ লেখাপড়া না জানলেও যেমন চালাক, তেমন চটপটে। তাছাড়া প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওর এত খেয়াল যে পুষ্পলতা মনে মনে খুবই খুশি হলেন, কিন্তু সে কথা নীলকান্তকে বললেন না। শুধু বললেন, জগদানন্দ সত্যি খুব দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মাঘীপূর্ণিমার দিন বড় রানীমা দেহ রাখলেন। শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়াকলাপ মিটে যাবার পর রায়বাহাদুর রাজাসাহেবকে বললেন, নীলকান্ত, এবার তো তোমার গান-বাজনা আর পড়াশুনা নিয়ে থাকলেই চলবে না। এস্টেটের কাজকর্মও দেখতে হবে।

নিশ্চয়ই দেখব।

কিন্তু মুখে বললেই কি সব কাজ করা যায়? রায়বাহাদুর যখনই কোন জরুরী ব্যাপারে ওকে কিছু বলেন, তখনই নীলকান্ত জবাব দেন, কাকাবাবু, ওস্তাদজী চলে গেলেই আপনার সঙ্গে বসব। এই ক'টা দিন আপনি যা হোক করে চালিয়ে নিন।

এক ওস্তাদজী যান অন্য ওস্তাদজী আসেন। অন্য দিকে কালিদাস শেষ করে ভবভূতি ধরেন। জমিদারীর কাজকর্ম দেখার আর সময় হয় না নীলকান্তর।

শেষে রায়বাহাদুর একদিন পুষ্পলতাকে বললেন, ছোটমা, নীলকান্তকে দিয়ে কিছুতেই এস্টেটের কাজকর্ম করাতে পারছি না। এদিকে আমারও বয়স হল। আমি একা আর এত দায়িত্ব নিতে পারছি না।

আপনিই বলুন, আমি কি করতে পারি?

তুমি মা লেখাপড়া শিখেছ। অত্যন্ত বুদ্ধিমতীও। সেজন্য আমি বলছিলাম কি, তুমিই এবার একটু-আধটু কাজকর্ম দেখা শুরু কর। তাছাড়া রানীমার মত একদিন হঠাৎ যদি আমিও চলে যাই···

পুষ্পলতা কি যেন ভাবেন। বলেন, ঠিক আছে। আমি যতটা পারি নিশ্চয়ই করব।

বছরখানেক পরে রায়বাহাদুর একদিন হাসতে হাসতে বললেন, রানীমা তার নিজের ছেলেকে ভাল ভাবেই চিনতেন। তাই তোমার মত মা লক্ষ্মীকে এনেছিলেন। তুমি মা শুধু বুদ্ধিমতী না, বিচক্ষণও।

পুষ্পলতাকে সব কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্যই বোধ হয় রায়বাহাদুর

এতদিন বেঁচে ছিলেন। সত্যি, বড় রানামার মত উনিও একদিন হঠাৎ চলে গেলেন।

মানুষ আসে যায়—কিন্তু সংসার আপন গতিতে চলে। টাঙ্গাইলের রাজবাড়িও চলছিল। ভালই চলছিল।

নীলকান্তও খুশি। তিনি আপন খেয়ালে দিন কাটান। বড় বড় ওস্তাদদের নিত্য আনাগোনা লেগেই আছে।

গানের নেশায় ভাসতে ভাসতে কখনও উনি চলে যান কাশী, কখনও লক্ষ্ণৌ, কখনও কলকাতা।

তবে এখন আর জগদানন্দ ওর সঙ্গে যেতে পারে না। নতুন ম্যানেজারবাবু এলেও জগদানন্দকে সব সময়ই জমিদারীর কাজে পুষ্পলতাকে সাহায্য করতে হয়।

তাছাড়া পুষ্পলতা তো কাছারিবাড়িতে যান না। ম্যানেজারবাবুও সব সময় অন্দরমহলে আসতে পারেন না। তাই জগদানন্দকেই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।

এইভাবেই চলছিল।

নীলকান্ত তখন কাশী গেছেন। দক্ষিণ দিকের বারান্দার কোণার ঘরে বসে রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর পুষ্পলতা জমিদারীর কাগজ দেখছিলেন। জগদানন্দকে নিয়ে ম্যানেজারবাবু এলেন কিছু জরুরী কথাবার্তা বলতে।

উনি যখন গেলেন তখন এগারোটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

ওরা চলে যাবার পরও পুষ্পলতা কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ ওর খুব নিঃসঙ্গ মনে হল। শরীরটাও যেন কেমন করছিল। বিন্দুবাসিনী নিশ্চয়ই সিঁড়ির কাছে বসে ছিল। একবার মনে করলেন তাকে ডাকবেন কিন্তু কি মনে করে তাকেও ডাকলেন না। শাড়ি-ব্লাউজ একটু ঢিলে করে বিরাট কৌচটায় শুয়ে পড়লেন।

চোখে ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়েই এপাশ ওপাশ করছিলেন। হঠাৎ মনে হল দরজার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘর থেকে কে যেন ওকে দেখছে।

কে দেখছে? ম্যানেজারবাবু আর জগদানন্দ ছাড়া তো আর কেউ এদিকে আসে না, আসার অনুমতিও নেই।

ম্যানেজারবাবু তো একটু আগেই চলে গেলেন। তিনি আবার আসবেন কেন? তাছাড়া তিনি তো খবর না দিয়ে অন্দরমহলের এই দোতলায় আসতে পারেন না।

বিন্দুবাসিনী কী? না, না, তার অত সাহস হতে পারে না। তাছাড়া ও বুড়ী রোজ রাত্তিরে আফিঙ খেয়ে ঝিমোয়।

পুষ্পলতা হাসলেন, মনে মনে খুশি হলেন—জগদানন্দ তাঁকে এমন আলুথালু অবস্থায় দেখছে।

পরের দিন সকালেই পুষ্পলতা ম্যানেজারবাবুকে ডেকে বললেন, আপনি তো এখন বেশ কিছু দিন ব্যস্ত। তাই আমিই দু-তিনদিনের জন্য রঘুনাথপুর ঘুরে আসি।...

সে তো ভালই হয়।

আপনি একটু খবর পাঠিয়ে দিন ওখানে।

সে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ম্যানেজারবাবু চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু পুষ্পলতার ডাকে পিছন ফিরলেন। পুষ্পলতা বললেন, এখন ওখানকার যা অবস্থা তাতে বেশী লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মোটরেই যখন যাব তখন শুধু জগদানন্দ সঙ্গে গেলেই হবে।

হ্যাঁ, সে-ই ভাল। ওখানে তো ঠাকুর-চাকর সবই আছে।

মোটরের পিছনের সীটে পুষ্পলতা একা বসে ছিলেন। ড্রাইভারের পাশে জগদানন্দ।

সারা পথে পুষ্পলতা একটি কথাও বললেন না। রঘুনাথপুরে

পৌঁছেও লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এত ব্যস্ত রইলেন যে জগদানন্দর দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না।

সব লোকজন চলে যাবার পর বাগানে পায়চারি করতে করতে পুষ্পলতা নায়েবমশাইকে বললেন, বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন খাব না। আমার খাবার আমার ঘরেই রেখে দিতে বলুন।

রঘুনাথপুরের নায়েবমশাই পুষ্পলতার দর্শন পেয়েই ধন্য। প্রজাদের ব্যাপার আলাদা কিন্তু অন্য কোন ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলার ধৃষ্টতা তার নেই। তাই উনি শুধু বললেন, যে আজ্ঞে।

আর হ্যাঁ, ওই বুড়ো রঘুনাথকে আর সারা রাত জেগে দোতলার বারান্দায় বসে থাকতে হবে না। জগদানন্দ তো আমার অফিস ঘরের ওপাশে থাকবে। ওকেই একটু সতর্ক থাকতে বলবেন।

যে আজ্ঞে।

রঘুনাথপুরে জমিদারবাবুদের আগমন হয় কালে-ভদ্রে। ইদানীংকালে একটা বিল নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলেই পুষ্পলতা এসেছেন।

রাজা বরদাকান্ত এখানে মাঝে মাঝে শিকারে আসতেন বলে একটা ছোট কুঠী তৈরি করান। দোতলা বাড়ি। নীচে বিরাট একটা হল আর খাবার ঘর। দোতলায় দু-পাশে দুটি শোবার ঘর। মাঝখানে বসার ঘর। জমিদারবাবুর কাজকর্মের জন্যও এই ঘরটি ব্যবহার করেন বলে অফিস ঘরও বলা হয়। দুটি শোবার ঘরের সঙ্গে দুটি বাথরুম। আর তিনটি ঘরেরই সামনে-পিছনে বিরাট দুটি বারান্দা।

এই কুঠীর পিছনে দিকে বেশ খানিকটা দূরে রান্নাঘর ও কর্মচারীদের থাকার জায়গা।

বাঈজী নিয়ে ফুর্তি করার জন্যই বরদাকান্ত এই রকম ভাবে এই কুঠী তৈরি করেন।

পুষ্পলতা যখন পায়চারি করার পর ওপরে উঠলেন তখন জগদানন্দর ঘরের আলো নিভে গেছে।

জগদানন্দ কি ঘুমিয়ে পড়ল? বোধ হয় না।

উনি ঘরে ঢুকতেই বুড়ো রঘুনাথের পুত্রবধূ সসম্ভ্রমে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল। এখানে কোন দাসী নেই, জমিদারবাড়ির রানীমা বা কোন মেয়ে এলে রঘুনাথের স্ত্রী বা পুত্রবধূই তাদের সেবা করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর পুষ্পলতা ওকে বললেন, এবার তুমি বাড়ি যাও। আমি শুয়ে পড়ি।

পুরো সাহেবী আদব কায়দায় লালিত-পালিত হওয়ায় পুষ্পলতার বরাবরই একটু শিথিল বসনে আলুথালু হয়ে শোওয়া অভ্যাস।

বেশ পরিবর্তনের পর শুতে যাবার আগে উনি একবার বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন।

খুব জোরে হাসতে ইচ্ছে করলেও কোন মতে সামলে নিয়ে মুখ টিপে হাসলেন। মনে মনে বললেন, আমি জানতাম জগদানন্দ, তুমি ঘুমোও নি, তুমি ঘুমোতে পারবে না।

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে পুষ্পলতা শুয়ে পড়লেন। বালিশের তলায় টর্চলাইট আর পিস্তলটা আগেই লুকোনো ছিল। শোবার পর একবার বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখে নিলেন। হ্যাঁ, ঠিকই আছে।

সারাদিনের ক্লান্তির পরও চোখে ঘুম এলো না পুষ্পলতার।

বেশীক্ষণ না, দশ-পনেরো মিনিট পরেই অফিস ঘরের দরজা ফাঁক করে একটা ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকল।

জানালার মধ্যে দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছিল, তাতেই পুষ্পলতা ছায়ামূর্তিকে চিনলেন, স্বয়ং জগদানন্দ।

দুটি চোখের পাতা সামান্য ফাঁক রেখে ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে রইলেন পুষ্পলতা।

হ্যাঁ, জগদানন্দ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। দুটি আঙুল দিয়ে তুড়ি দিল।

পুষ্পলতা নীরব। জগদানন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে একটু গলার আওয়াজ করল।

না, পুষ্পলতা এবারও ওকে কিছু বুঝতে দিলেন না।

জগদানন্দ আরো এগিয়ে এসে পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই গলার আওয়াজ করল।

জগদানন্দ মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুষ্পলতাকে দেখল। তারপর অত্যন্ত সতর্কভাবে ওর মাথায় একবার হাত দিল।

না, পুষ্পলতা সত্যি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

এবার ছোট্ট টর্চলাইটের আলোয় পুষ্পলতার সর্বাঙ্গের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল জগদানন্দ। তারপর টর্চ নিভিয়ে আল্‌তো করে পুষ্পলতার মাথায় মুখে হাত বুলালো বেশ কয়েক মিনিট ধরে।

পুষ্পলতা তখনও কিছু বললেন না। শুধু একবার খুব জোরে নিশ্বাস ফেললেন।

জগদানন্দর আরো সাহস বেড়ে গেল। আস্তে পালঙ্কের একপাশে উঠে বসে একটু ঝুঁকে পুষ্পলতার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতেই উনি পাশ ফিরে শুয়ে আল্‌তো করে জগদানন্দর গায়ে হাত রাখলেন।

জগদানন্দ সামান্য একটু নিবিড় হতেই পুষ্পলতা অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, শোবে না ?

জগদানন্দ যেন হাতে স্বর্গ পেল।

খেলা যখন ভাঙল পুষ্পলতা মুচকি হেসে বললেন, জগদানন্দ, ভুলে যাও কেন আমরা জমিদার। আমরা চুরি করা পছন্দ করি না, ডাকাতদের প্রশংসা করি। যদি কিছু পেতে চাই তবে দিনের আলোয় লাঠিয়াল পাঠিয়ে কেড়ে নিই।

জগদানন্দ চুপ।

পুষ্পলতাই আবার বললেন, তুমি তো ছোটবেলা থেকেই জমিদার বাড়িতে মানুষ হয়েছ। চুরি করে কোন দিন আমাকে দেখবে না। যদি সাহস থাকে তাহলে এসো, নইলে কখনই এসো না।

তারপর একটু চুপ করে থাকার পর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, তোমাকে আমারও প্রয়োজন।

অক্ষয়দা খুব জোরে হেসে উঠে বললেন, কি রে কেষ্ট, আরো পড়ব ?

কেষ্টদা দন্ত বিকশিত করে বললেন, না পড়লেও পুরো ঘটনাটা বল।

অক্ষয়দা বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, শুধু যে ওদের অবৈধ সম্পর্ক পাকাপাকি ভাবে গড়ে উঠল, তা নয়, আরো অনেক কিছু ঘটেছিল।

নিত্যানন্দদা জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি ?

অক্ষয়দা বললেন, তা নয়তো কী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শুধু শুধুই প্রিভি কাউন্সিলের পরামর্শ নিয়েছিল ?

কেষ্টদা বললেন, তা তো বটেই।

এরপর অক্ষয়দা জল খেয়ে আবার শুরু করলেন, পুষ্পলতার গর্ভে দুটি সন্তান হয়। কুমার রজনীকান্ত ও শিখারাণী এবং দুটি সন্তানেরই জনক জগদানন্দ। খুব ছোটবেলাতেই ওদের দার্জিলিংয়ের বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেন পুষ্পলতা···

কেন ?

কারণ পুষ্পলতা বোধ হয় ভেবেছিলেন সন্তান দুটিকে রাজবাড়ি থেকে দূরে দূরে রাখাই নিরাপদ।

ছুটির সময়ও ওরা টাঙ্গাইল আসে না। পুষ্পলতাই ওদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান।

এদিকে জগদানন্দই আসল জমিদার হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম রাজাসাহেব পুষ্পলতা বা জগদানন্দর কথা মত সব কাগজপত্র সই করে দিতেন। কিন্তু ছেলেমেয়ের জন্মের পর নিজেই আস্তে আস্তে জমিদারীর কাজকর্ম দেখা শুরু করেন। প্রথমে মতবিরোধ, তারপর নিত্য ঝগড়া।

এই ভাবেই আরো ক'টা বছর কাটল

তারপর হঠাৎ একদিন জগদানন্দর হাতে পুষ্পলতার পিস্তলটা গর্জে উঠল। রাজা নীলকান্ত এক চুলের জন্য বেঁচে গেলেন।

সে কী! আমরা তিন-চারজন একসঙ্গে বলে উঠি।

অক্ষয়দা ম্লান হেসে বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আরো শুনতে চাও?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

মামলা শুরু হল। জগদানন্দর পক্ষে সাক্ষী দিলেন পুষ্পলতা ও তার দুটি ছেলেমেয়ে।

বলেন কী! আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অক্ষয়দা অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বললেন, রাজা নীলকান্ত চিরকালের মত গান-বাজনা ছেড়ে দিলেন। রাজবাড়ির বাগানের এক কোণে একটি ঘর তৈরি করালেন। আর ওই ঘরের মধ্যেই টিউবওয়েল বসিয়ে নিজে রান্না করে খেতেন।...

কেন?

কেন আবার? যদি স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বা জগদানন্দ বিষ খাইয়ে মারে—

আমাদের কারুর মুখে আর কোন প্রশ্ন নেই। অক্ষয়দা ম্লান হেসে বললেন, আজকের নাগপুর হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার কে. আর. কে. চৌধুরীই সেই পুষ্পলতার গর্ভে জগদানন্দর পুত্র কুমার রজনীকান্ত চৌধুরী!

রুদ্ধ নিশ্বাসে শেষটুকু শোনার পর কেষ্টদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইনিই রাষ্ট্রদূত হলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অকালপক্কতা প্রায় সবার জীবনেই কোন না কোন সময় আসে। স্কুলের একটু উঁচু ক্লাসে উঠলেই অকালপক্কতার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর তারই ঢেউ চলে বেশ কয়েক বছর।

সর্বজনীনভাবে এ রোগের প্রকাশ দেখা যায় সদ্য কলেজে ঢোকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তবে শুধু এরাই এ রোগে ভোগে না।

যে সব ছেলেমেয়ে মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে তাদের হাব-ভাব চাল-চলন কথাবার্তা দেখে মনে হয়, যেন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। নিদেন পক্ষে হাউস সার্জেন বা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র।

মাসিক দশ-বারো টাকা বেতন দিয়ে সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টার জন্য পঁচিশ-তিরিশ জন ছাত্রছাত্রীর একজন হয়ে শুভদা বা দেবুদার স্কুলে গান বাজনা শিখছে মাত্র বছর খানেক, যারা কত মাত্রায় ত্রিতাল, ঝাঁপতাল বা চৌতাল হয় মনে রাখতে পারে না, তারা নির্বিবাদে বড় বড় ওস্তাদ বা গাইয়েদের গানবাজনা নিয়ে সমালোচনা করে।

অকালপক্কতার নানা রকম প্রকাশ দেখা যায়। চীফ সেক্রেটারীর চাইতে অখ্যাত মহকুমার সদ্য নিয়োজিত এস-ডি-ও এবং প্রবীণ মন্ত্রীদের চাইতে প্রথম নির্বাচিত এম. এল. এ. বা এম. পি-দের হাঁকডাক অনেক বেশী।

তবে সবচাইতে অকালপক্ক হয় অনভিজ্ঞ সাংবাদিকরা। বিশেষ করে ছোকরা রিপোর্টাররা।

কেরানী, স্কুল মাস্টার, অখ্যাত কলেজের নাম-না-জানা লেকচারার বা সাধারণ অফিসারের পুত্র যখন প্রেস কার্ড পকেটে নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়, পাঁচ-তারা হোটেলে খানাপিনা করে বা সরকারী আমন্ত্রণে বিমানে সফর করে, তখন আর সে বেচারা তাল সামলাতে পারে না।

সব মানুষের শৈশবেই যেমন হাম হবেই, তেমনি সব তরুণ রিপোর্টারদের মধ্যেই এই অকালপক্কতা দেখা দেবেই। আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না।

সামান্য সুযোগ পেলেই আশেপাশের লোকজনকে জানিয়ে দিই, আমি রিপোর্টার। পান থেকে চুন খসলেই খবর ছাপিয়ে দেব অথবা মন্ত্রীর কাছে নালিশ করব বলি।

মোট কথা, সবাইকে বুঝিয়ে দিই, আমি একজন অসামান্য প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

তাছাড়া মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা প্রায় সব সাংবাদিকেরই ধর্ম। প্রেস কার্ড পকেটে নিয়ে কিছু কাল ঘোরাঘুরির পর আমিও ধর্মান্তরিত হই।

তাছাড়া অক্ষয়দার কাছে কিছু গল্প শুনে আমার মাথা আরো খারাপ হয়ে গেল। অধিকাংশ গণ্য-মান্য-বরেণ্য মানুষের মধ্যেই আমি কলঙ্কের ছাপ দেখি। অত্যন্ত সন্দেহ করি। অনেক সময় প্রগল্‌ভতার জন্য হঠাৎ যা তা বলে দিই।

একদিন নিউজ ডিপার্টমেন্টে অক্ষয়দার সামনে বিশিষ্ট একজন রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে একটা নোংরা মন্তব্য করতেই উনি জ্বলে উঠলেন। হাতের কলম নামিয়ে রেখে আঙুল নেড়ে আমাকে ডাকলেন, ওহে শোন—

তাকিয়ে দেখি অক্ষয়দার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ফাঁসীর আসামীর মত ওঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখুনি কী বললে ?

আমি নীরব। মুখ দিয়ে কথা বের করার মত সাহস ও ক্ষমতা দুই-ই বিলুপ্ত।

আমি চুপ করে থাকলেও উনি পারলেন না। প্রশ্ন করলেন, তুমি হিমাদ্রিকে কত দিন ধরে চেনো ?

মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, ছ-মাসও হবে না। তাই সে প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারলাম না।

ওকে আমি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে চিনি। দশ-বারো বছর একই সঙ্গে জেল খেটেছি। হেলেন অব ট্রয় ন্যাংটা হয়ে ওর সামনে নাচলেও ওকে টলাতে পারবে না। বুঝলে ?

আমি তখনও আসামীর কাঠগড়ায়। সারা ঘরের সবাই আমার বিচার দেখছেন।

অক্ষয়দা একটু থেমে বললেন, পার্ল বাকের মত হিমাদ্রিও জারজ সন্তান মানুষ করেছে। যে ডাগর-ডোগর মেয়েটিকে ওর সঙ্গে দেখেছ, সে ওর নাতনী।

আমি অবাক। আমি কার্জন পার্কের ধারে ওই মেয়েটির সঙ্গে হিমাদ্রিবাবুকে দেখেই মনে মনে একটা সস্তা সিনেমার প্লট ভেবে নিয়েছিলাম।

কী রকম নাতনী শুনবে ?

কি উত্তর দেব, শুধু চোরের মত ওর মুখের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকাই।

অক্ষয়দা এবার বলেন, প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কয়েক পা এগুতেই জেলখানার পাঁচিলের ধারে একটা সদ্যোজাত শিশুকে ও কুড়িয়ে পেয়েছিল। বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে হিমাদ্রি তাকে তুলে নিয়েছিল।

ইচ্ছা করল, ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড় বসিয়ে দিই। অক্ষয়দা হেসে বললেন, চিরকুমার হিমাদ্রি তাকে নিজের সন্তান বলে

চা আনতে সবিতা ভিতরে যেতেই প্রমোদদা আবার বলেন, ওকে অত দূরে বিয়ে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। বিয়ের পরও যদি জামাই সবিতাকে নিয়ে আমার আছে থাকত, তাহলে খুব ভাল হত।

অক্ষয়দা বললেন, সবাই কি আর ঘর-জামাই হতে চায়?

তা ঠিক, কিন্তু আমিও যেমন সবিতাকে ছেড়ে থাকতে পারি না, তেমনি ও-ও আমাকে ছেড়ে শান্তি পায় না।

এ ট্র্যাজেডি তো সব মেয়ের বাপেরই।

প্রমোদদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই বুঝি অক্ষয়, কিন্তু মন যে মানে না।

কাকাবাবু না? তিরিশ-বত্রিশ বছরের একজন সুপুরুষ যুবকের প্রশ্নে অক্ষয়দা চমকে ওঠেন।

তুমি?

আমি সুপ্রকাশ। সুপ্রকাশ চৌধুরী···

আরে জামাই?

সুপ্রকাশ হেসে বলল, হ্যাঁ।

অক্ষয়দা ওর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি এখানে? বেড়াতে? নাকি কোন সেমিনারে···

আমি তো এখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে আছি।

তাই নাকি? কবে জয়েন করলে?

তা অনেক দিন হয়ে গেল।

অক্ষয়দা ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, তা মাদুরাই ছেড়ে হঠাৎ চলে এলে কেন? এখানে কী বেটার কিছু পেয়েছ?

সুপ্রকাশ অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারলেই ভাল হত কাকবাবু।

তার মানে?

ও লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তার মানে বলতেও লজ্জা

হয়। মানুষ যে এত নোংরা হয়, তা কোন দিন ভাবি নি।

ওর বেসুরো কথা শুনে অক্ষয়দার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি এ ধরনের কথা বলছ কেন বাবা? কে তোমাকে দুঃখ দিল?

সবিতা আর ওই মহাবিপ্লবী বদমাইসটা।

অক্ষয়দার পিঠে কেউ যেন সপাং করে চাবুক কসাল।

অক্ষয়দা কিছু বলার আগেই সুপ্রকাশ গড়গড় করে বলে গেল, জেনে রাখুন কাকাবাবু, সবিতাকে মানুষ করলেও প্রমোদরঞ্জন তাকে রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করেন। এবং···সুপ্রকাশের গলা যেন আটকে যায়।

চোখ বড় বড় করে বিস্ময়ের সঙ্গে অক্ষয়দা বলেন, তুমি কি যা তা বলছ!

সুপ্রকাশ মাথা নেড়ে বলল, আমি যা তা বলছি না কাকাবাবু। অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমি সবিতাকে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম, প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

কিন্তু–

কোন কিন্তু নেই কাকাবাবু, পরে বাধ্য হয়ে সবিতা নিজেই সব স্বীকার করেছে। সবিতাকে নিয়ে প্রমোদরঞ্জন আরো অনেক কেলেঙ্কারী করেছেন কিন্তু সে-সব কথা আমি আপনাকে বলতে পারব না।

লজ্জায় দুঃখে অক্ষয়দা মুখ নীচু করে বসে থাকেন দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির এক কোণায়। সামনে উত্তরবাহিনী গঙ্গা। সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে মন্দিরে। বিশ্বনাথের মন্দির থেকেই বোধ হয় কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। গোধূলির এমন পবিত্র মুহূর্তে এই স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর ও পবিত্র পরিবেশেও বিষিয়ে গেছে ওঁর মন। তিনি যেন চোখেও কিছু দেখছেন না, কানেও কিছু শুনছেন না।

সুপ্রকাশও নীরব। স্বপ্ন দেখেছিল সে, প্রমোদবাবুর পালিতা কন্যা

তার জীবনে ভাগীরথের মত গঙ্গা বয়ে আনবে···কিন্তু এ কি হল? কেন, কেন ওরা দুজনে এভাবে ওর জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন ভেঙে দিলেন? নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার হয়তো সবার আছে, কিন্তু অন্যের জীবনকে বিষময় করে তোলার অধিকার কে কাকে দিল?

হঠাৎ অক্ষয়দা ওর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললেন, তুমি বাবা, আমাকে ক্ষমা কর।

এ কি বলছেন কাকাবাবু। আপনি তো কোন অপরাধ করেন নি। আপনি কেন···

অক্ষয়দা সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, জানি আমি কোন অন্যায় করি নি, কিন্তু তবু তোমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে মনে শান্তি পাচ্ছি না।

প্রমোদ ঘোষের কাহিনী শুনে আমরা সবাই হতবাক।

অক্ষয়দা বললেন, ওঁর মত সর্বত্যাগী, মহাবিপ্লবী, দেশপ্রেমিক বাংলাদেশে খুব কম জন্মেছে। উনি দেশের জন্য যে কত স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট করেছেন তা ভেবে আমি অবাক না হয়ে পারি নি। দেশের জন্য ওঁর ওই সব গুণ ও ত্যাগের কথা ভেবে যেমন অবাক হই, তেমনি সবিতার ব্যাপারে ওঁর দুর্বলতার কথা ভেবেও অবাক হই—কিন্তু কোনটাই তো মিথ্যে নয়। দুটোই সত্যি।

আমরা কে কী বলব? ভাবছি, আর এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নীরবে বলছি, কি আশ্চর্য! প্রমোদ ঘোষেরও এই ধরণের দুর্বলতা থাকতে পারে?

হঠাৎ কেষ্টদা অক্ষয়দার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুধু প্রমোদ ঘোষ কেন, দীনবন্ধু কি ছিলেন?

অনেকক্ষণ গম্ভীর থাকার পর অক্ষয়দা এক গাল হেসে বললেন, ঠিক, দীনবন্ধুর কাছে প্রমোদদা তো শিশু!

ওদের তুজনের মুখে দীনবন্ধুর নাম শুনেই আমরা রিপোর্টার-সাব এডিটর-প্রুফ রীডাররা আকাশ থেকে পড়ি। কোটি কোটি বাঙালীর হৃদয়ে মুষ্টিমেয় যে ক'জন সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক চিরকালের জন্য আসন বিছিয়ে বসেছেন, দীনবন্ধু তাঁদেরই একজন। লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে তাঁর ছবি, শহরে-নগরে তাঁর মূর্তি। তাঁরও জীবনে কোন রহস্য ছিল নাকি?

চীফ রিপোর্টার চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, ওকে নিয়ে আবার টানাটানি করছেন কেন?

অক্ষয়দা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, শোন বিকাশ, সব সাধুই যেমন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ না, তেমনি সব রাজনৈতিক নেতাই সি. আর. দাশ বা সুভাষবাবু না। ওঁরা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি ছিলেন। মানুষ হয়েও মানুষের তুর্বলতা ছিল না বলেই সি. আর. দাশ বা সুভাষবাবু সবার হৃদয় জয় করেছিলেন।

বিকাশদা চুপ। অক্ষয়দা একটু থেমে বলেন, ওঁরা তুজন ছাড়া আর সব নেতাই যে চরিত্রহীন ছিলেন তা বলছি না, কিন্তু কিছু দৈন্য বা তুর্বলতা ছিল না এমন নেতার কথা তো অন্তত আমার মনে পড়ে না।

কেষ্টদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক বলেছ।

এবার অক্ষয়দা হেসে বললেন, আমাদের দেশে কেউ একটু খ্যাতি-যশ অর্জন করলেই তাকে দেবতা মনে করা হয়। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি বা অন্য কোন ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করলেই কি মানুষ সাধু হয়ে যায়?

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। তাই আমরা বলতে বাধ্য হলাম, তা বটেই।

উনি আবার হেসে বলেন, পুরানো দিনের কথা বাদই দিলাম। এই যে শিখর, যে ছোকরা বিপ্লবী নাটক করে খুব নাম-টাম করেছে, তার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানো?

শিখর দত্ত তখন বাংলা নাট্য আন্দোলনের একটি জ্যোতিষ্ক।

নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর চিত্ত জয় করেছেন। আমরা অনেকেই তাঁর গুণমুগ্ধ। তাই শিখর দত্তর নাম শুনেই আমরা বড় বড় চোখে ওঁর দিকে তাকাই।

অক্ষয়দা শুরু করলেন, শিখরের বাবা জ্যোতিষ দত্ত ছিলেন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর। হারামজাদা আমাদের ওপর কী অত্যাচারই না করেছে—

বলেন কী।

সঙ্গে সঙ্গে জামা-গেঞ্জি তুলে উনি একটা অপারেশনের দাগ দেখিয়ে হেসে বললেন, বহরমপুরে জেলে থাকার সময় সামান্য একটা অজুহাতে পুলিশ আমাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। শিখরের বাবার বুটের লাথির স্মৃতি আমাকে সারা জীবন বইতে হচ্ছে।

ইস!

ইস কি করছ, শিখরের দাদাও কি কম গুণী? সে হতচ্ছাড়া রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লা খনির ম্যানেজার ছিল। সাধারণ কুলি-খালাসী থেকে সাধারণ কর্মচারীদের ওপর অত্যাচারের কথা তো বাদই দিলাম—ডাগর-ডোগর মেয়ে বউ চোখে পড়লে আর নিস্তার ছিল না।

বলেন কী?

ঠিকই বলছি, শুনে রাখ। ওই জানোয়ারটা পুকুর চুরি করে করে আসানসোলে ক'খানা বাড়ি করেছে জানো?

আমরা আর জানতে চাই না। তাই চুপ করে থাকি।

অক্ষয়দা মাথা নেড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমাদের ওই বিপ্লবী নাট্যকার দেশ স্বাধীন হবার পর অন্য দেশের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করত, তা জানো কী?

আমরা দু-তিনজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠি, বলেন কী!

বিকাশদার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, তুমি তো পাকা রিপোর্টার, কিন্তু জানো কি ওর নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছিল?

বিকাশদা মাথা নেড়ে বললেন, না জানি না।

এই বিপ্লবী নাট্যকার তখন প্রমোদদার সুপারিশে সর্দার প্যাটেলের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আর মুচলেকা দিয়ে তবেই নাগরিকত্ব ফিরে পায়। বিদ্রূপের হাসি হেসে উনি বললেন, এ হেন ব্যাটা না হলে কি বিপ্লবী নাট্যকার হওয়া যায় ?

সেদিনের মত আসর ভাঙলেও আমরা অনেকেই দীনবন্ধুর কাহিনী জানার জন্য উদগ্রীব রইলাম। অক্ষয়দার আড়ালে বা অনুপস্থিতির সময় কেষ্টদাকে ধরি। উনি হেসে বলেন, অক্ষয় তো বললই যে দীনবন্ধু দেবতা ছিলেন না। ও নিজেই একদিন সব বলবে। আমাকে কিছু বলতে হবে না। তাছাড়া ওরা পলিটিক্স করেছে। ওরা যা জানে, তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব ?

এর পরই সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন শুরু হল যে আমরা নিশ্বাস ফেলার সময় পাই না। ওদিকে কোরীয়-ইন্দোচীন আর দিল্লীর পার্লামেন্টের খবরের ধাক্কা সামলাতে সাব-এডিটররাও ব্যস্ত। সবকিছু সামলাতে অক্ষয়দাও এক মিনিটের ফুসরত পান না। মোদ্দা কথা, মাসখানেক আর তেমন আড্ডাই জমে উঠল না। তবে পরবর্তী আড্ডার দিনই দীনবন্ধু যেন সশরীরে আমাদের সামনে হাজির হলেন।

ডাক্তার যদুনাথ বসু তখন চিকিৎসক হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। ডাঃ বসু রোগীর নাড়ি দেখতে দেখতে তার মুখের দিকে তাকিয়েই নাকি রোগ ধরতে পারতেন। তারপর দু'শিশি মিকশ্চার আর দশ-বারোটা পুরিয়া। ব্যস! যে রোগীর আশা সবাই ছেড়ে দেন, তিনিও আবার হাঁটতে-চলতে শুরু করেন।

এখনও অনেক বৃদ্ধ বলেন ব্যারিস্টারীতে দেশবন্ধু আর ডাক্তারীতে দীনবন্ধু যা আয় করেছেন, তা আর কোন ব্যারিস্টার বা ডাক্তার করেননি, করবেনও না।

সত্যিই তিনি আয় করতেন দশ হাতে। কলকাতার প্রথম চারতলা বাড়ি নাকি উনিই তৈরি করেন। তিনটে বড় বড় মোটরগাড়ি

ছিল তাঁর—তখনকার দিনে লাটসাহেব ছাড়া আর কারুর তিনটে মোটরগাড়ি ছিল না।

শোনা যায় একবার বর্ধমানের মহারাজা খুব অসুস্থ হন। স্বাভাবিক ভাবেই ডাঃ যদুনাথ বসুকে দেখাবার পরামর্শ দিলেন মহারাজার ব্যক্তিগত চকিৎসকরা। যোগাযোগ করা হল। হ্যাঁ, ডাঃ বসু যাবেন। তবে এখনই হবে না, বিকেল সাড়ে চারটের সময়।

যথাসময়ে মহারাজার গাড়ি এলো ওকে নিয়ে যাবার জন্য—কিন্তু গাড়ি এসেছে শুনেই উনি রেগে লাল। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন, আমি পরের গাড়ি চড়ি না, এ আপনি জানেন না?

স্যার, প্যালেসের নিয়ম বলেই···

ও, প্যালেসের নিয়ম আছে আর আমার কোন নিয়ম থাকতে নেই? ডাঃ বসু তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, হিজ হাইনেস যদি এই গাড়ি আমাকে বিক্রী করেন, তাহলে ওই গাড়ি চড়ে আমি যেতে পারি। নয়তো হিজ হাইনেসকে আমার চেম্বারে আসতে হবে।

প্রাইভেট সেক্রেটারীর তো চোখ ছানাবড়া। লোকটা বলে কি! কিন্তু এমনই পরিস্থিতি যে উনি তর্ক না করে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন প্যালেসে। পরামর্শ করে ফিরে এলেন ডাঃ বসুর কাছে। বললেন, হ্যাঁ স্যার, হিজ হাইনেস এই গাড়ি আপনাকে বিক্রি করবেন।

মহা খুশি হয়ে ডাঃ বসু হিজ হাইনেসের গাড়িতে চড়েই ওকে দেখতে গেলেন।

হ্যাঁ, হিজ হাইনেস তাঁর কথা রেখেছিলেন। সুস্থ হবার পর মহারাজা একদিন ওকে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমার পাওনা একটা টাকা দিন।

আপনি আমার কাছে একটা টাকা পাবেন?

হিজ হাইনেস একটু হেসে বললেন, গাড়িটা কিনলেন, তার দাম দেবেন না?

ডাঃ বসু গাছ থেকে পড়লেন।—ওই গাড়ির দাম এক টাকা ?

হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব, ওই গাড়ির দাম এক টাকাই। হিজ হাইনেস বললেন, আমি আমার কথা রেখেছি। এবার আপনি আপনার কথা রাখুন।

শেষ পর্যন্ত ওই এক টাকা দিয়েই গাড়ি নিতে হল ডাঃ যদুনাথ বসুকে। তবে এই ঘটনার পর দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়।

যাই হোক ডাঃ যদুনাথ বসুকে রোগী দেখতে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও যেতে হয়, না গিয়ে পারেন না। কখনও যান বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া, কখনও আবার যশোর-খুলনা। অনেক সময় আরো অনেক দূরে।

ঠিক এই সময় গান্ধীজি আর সি. আর. দাশ সারা ভারতবর্ষ মাতিয়ে তুলেছেন। দেশবন্ধু তখন বাঙালীর হৃদয়-সম্রাট। যদুনাথ খবরের কাগজে ওঁদের খবর পড়েন প্রতিদিন। দু-একদিন যাতায়াতের পথে দেশবন্ধুর সভা বা শোভাযাত্রাও দেখেন। মনে মনে ভাবেন, সত্যি, দেশের মানুষ ওঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে কিন্তু ভুল করেও মনে হয় না, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এইভাবে আরো ক'টা বছর কেটে গেল।

একবার কাশিমবাজার রাজবাড়ির এক রুগীকে দেখে যদুনাথ রেলগাড়িতে ফিরছিলেন কলকাতা। গাড়ি থামল কৃষ্ণনগর স্টেশনে। হঠাৎ একদল ছেলের 'বন্দেমাতরম্' চিৎকার আর হৈচৈ শুনেই চমকে উঠলেন। পরমুহূর্তেই গুলীর আওয়াজ।

যদুনাথ আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখলেন কয়েক শো পুলিশ মাত্র পনেরো-বিশজন ছেলেকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করছে। কিছু দূরে একটা ছেলে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে। আর ওই লাঠিপেটা খেতে খেতেও ছেলেরা মাঝে মাঝেই চিৎকার করছে—বন্দেমাতরম্! সঙ্গে সঙ্গে সাহেব অফিসারদের লাথি আর দেশী পুলিশের লাঠি পড়ছে।

যদুনাথ নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে ইংরেজ অফিসারের হাত চেপে ধরে চিৎকার করলেন, স্টপ দিস ননসেন্স।

পরের দিন সকালে কলকাতার সব কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হল, বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ যদুনাথ বসু গ্রেপ্তার!

শুধু বাঙালীরা না, স্বয়ং লাটসাহেবও চমকে উঠলেন খবর পড়ে। গুরুতর প্রতিক্রিয়ার ভয়ে লাটসাহেব সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, রিলিজ ডক্টর বাসু ইমিডিয়েট্‌লি।

এদিকে ভোরবেলার কাগজে খবর পড়েই বর্ধমান আর কাশিমবাজারের মহারাজা কৃষ্ণনগর হাজির।

দেশবন্ধু কলকাতায় ছিলেন না। কি একটা জরুরী কারণে উনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য এলাহাবাদ গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই টেলিগ্রাম পাঠালেন গভর্ণর আর ডাঃ বসুকে।

তারপর?

দেশবন্ধু কলকাতা ফিরতেই ডাঃ বসু ওঁকে প্রণাম করে বললেন, আমি আর বিদেশী পোশাক পরব না। প্রথম খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবিটা আপনিই আমাকে ভিক্ষা দিন।

আনন্দে খুশিতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দেশবন্ধু ওঁকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

শুরু হল সারা জীবনের অর্জিত অর্থ বিলিয়ে দেওয়া। যে কোন দীন-দুঃখী সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হল। আর রাজনৈতিক কর্মীদের দুঃখ-কষ্টের কথা কানে এলেই ছুটে যেতেন তাদের কাছে।

প্রাসাদোপম বাড়ি। দান করে দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। সেই দামী দামী মোটরগাড়িগুলো? প্রচুর দামে বিক্রী করলেন বর্ধমানের মহারাজা আর কাশিমবাজারের মহারাজার কাছে। আর সেই অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন রাজনৈতিক কর্মী ও দীন-দুঃখীদের।

তবে হ্যাঁ, স্বয়ং দেশবন্ধুর পরামর্শে ডাক্তারী ছাড়লেন না। যে রুগী

আসে, তাকেই দেখেন। যারা কল দেয় তাদের কাছেই ছুটে যান। নিজে কিছু দাবীও করেন না, প্রত্যাশাও করেন না। যে যা দেয় তা-ই হাসিমুখে গ্রহণ করেন। তবু প্রচুর আয়, কিন্তু মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট ও প্রয়োজন যে তাতে কিছুই হয় না।

এমনি করেই দিন যেতে যেতেই ডাঃ যদুনাথ বসু দীনবন্ধু যদুনাথ হয়ে গেলেন।

সত্যি, মুগ্ধ হয়ে যাবার মতই কাহিনী। আমরা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি না। মনে মনে ভাবি। মুগ্ধ মনে চোখের সামনে যেন সবকিছু দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে ওঁর শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তিটা।

অক্ষয়দার মামাবাড়ি ছিল বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে। স্কুলে পড়ার সময় ছুটির ক'টা মাস ওরা সব ভাইবোনে মামাবাড়িতে দাদু-দিদিমার কাছে কাটাতেন।

বিরাট বাড়ি। একতলা-দোতলা মিলিয়ে বারো-তেরোটা ঘর। বিরাট উঠোন। অন্য ভাইবোনেরা দিদিমার কাছে কাছে থাকলেও অক্ষয়দাকে ওর ছোট মাসী গঙ্গাই নিজের কাছে রাখত। ছোট মাসীকে অক্ষয়দারও খুব পছন্দ। রাত্রে ওর কাছে শুয়ে অক্ষয়দা কত গল্প শুনতেন।

একবার গরমের ছুটিতে ওরা মামাবাড়ি এসে দেখলেন বাড়ির অর্ধেকটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দাদু তখন বেঁচে নেই। বড়মামা পাটনায়। অত বড় বাড়ি দিয়ে কি হবে? মামারা তাই পুলিনবাবুকে অর্ধেকটা ভাড়া দিয়েছেন।

পুলিনবাবুর বয়স বেশী নয়। বড়জোর বছর চল্লিশেক কি বোধ হয় তারও কম। ডাক্তারী করেন। শ্রীমানীদের বাজারের কাছেই তার চেম্বার।

পুলিনবাবুর স্ত্রীর ভাল নাম কি যেন ছিল। সবাই ডাকত চিনু বলে।

চিন্নুর বয়স তখন তিরিশ-বত্রিশ হবে। চেহারাটা ভারী আঁট-সাঁট। নাকটা সামান্য একটু চ্যাপ্টা হলেও মুখখানা ভারী সুন্দর। বয়সে ছোট হলেও গঙ্গার সঙ্গে ওর খুব ভাব। সে জন্য অক্ষয়দাকেও উনি খুব ভালবাসেন।

অক্ষয়দারা সব ভাইবোনই ওকে চিন্নুদি বলে ডাকতেন।

অক্ষয়দা রোজ বিকেলবেলায় দেখতেন, চিন্নুদি খুব সাজগোজ করেন। তারপর ছোট মাসীর ঘরে এসে বলেন, দেখ তো গঙ্গা, মুখে পাউডার লেগে আছে নাকি?

গঙ্গা ওর মুখ থেকে পাউডার মুছে দিতে দিতেই সন্ধ্যে হত। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজার সামনে একটা মোটরগাড়ি এসে থামত।

মোটরগাড়ির শব্দ শুনে বাড়ির বড়রা কেউ বাইরে না এলেও ছোটরা সবাই সদর দরজার আশেপাশে ভীড় করত। অক্ষয়দা দেখতেন, মোটরগাড়ির ভিতরে একজন প্রবীণ লোক বসে। চিন্নুদি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মোটরগাড়িটা চলে যেত।

তারপর আবার অনেক রাত্রে ওই মোটরগাড়ি চড়েই চিন্নুদি ফিরে আসতেন।

একদিন চিন্নুদি ফিরে এসেই এক বাণ্ডিল দশ টাকার নোট ছোট মাসীর হাতে দিয়ে বললেন, নে, রেখে দে।

গঙ্গা টাকার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বললেন, আগেরও তো অনেক টাকা আমার কাছে পড়ে আছে।

চিন্নুদি হেসে বললেন, থাক না। তুই কি পালিয়ে যাচ্ছিস?

ছুটিতে মামাবাড়ি এসে অক্ষয়দা এই দৃশ্য দেখতেন প্রতিবার। বছরের পর বছর।

শ্রীমানীদের বাজার বেশী দূরে নয়, বেশ কাছেই। পুলিন ডাক্তারের কাছে বিশেষ রুগী না এলেও তার ল্যাণ্ডো ছিল। ডাক্তারখানা দেখেও মনে হত, প্রচুর আয়।

অক্ষয়দা সবকিছু জানতে না পারলেও বুঝতে পারেন, চিনুদির কিছু রহস্য আছে।

মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগে। মাঝে মাঝেই চিনুদি মোটরগাড়ি চড়ে ঘুরে এসে ছোট মাসীর কাছে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা দেয়

কিন্তু ওই টাকা সে পায় কোথায়? একবার ছোট মাসীকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন কিন্তু উনি কায়দা করে এড়িয়ে যান।

আরেক দিন উনি গঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ছোট মাসী, মোটরগাড়ির মধ্যের ওই বুড়োটা কে?

এক ডাক্তারবাবু। পুলিনদা ওর ছাত্র।

ছোট মাসী আর কিছু বলে নি কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? পাড়ার ছেলেরাই একদিন ওকে বলে দিল। ছেলেরা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, আরে, ও হচ্ছে দীনবন্ধু যত্নাথ। আমরা ওর নাম দিয়েছি চিনুদা।

আমরা দু-তিনজন রিপোর্টার-সাব-এডিটর প্রায় এক সঙ্গেই আঁতকে উঠি, সত্যি!

অক্ষয়দা কিছু বলার আগেই কেষ্টদা বলেন, হ্যাঁ, উনি যেমন পরোপকারী ছিলেন, তেমনই চরিত্রহীন ছিলেন।

অক্ষয়দা বললেন, এরই ক'বছর পর আমিও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম।

তখন দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসারও সুযোগ পেলাম। দেখলাম, উনি সত্যি দীনের বন্ধু। বিদ্যাসাগর আর দেশবন্ধু ছাড়া আর কোন বাঙালী এভাবে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন বলে আমি জানি না।

আমরা ওঁর প্রত্যেকটা কথা যেন গিলে গিলে খাই। মুখে কিছু বলি না।

অক্ষয়দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হেসে বললেন, এমন দেবতুল্য মানুষটিই কিন্তু সন্ধ্যার পর পশু হয়ে যেতেন। একে ওই

খ্যাতি-যশ, তার ওপর অর্থ। সারা বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য চিনুদি ছিল।

উনি একটু থেমে বললেন, মজার কথা দীনবন্ধু প্রকাশ্যেই চিনুদিদের নিয়ে বাগানবাড়ি বা ডাকবাংলোয় আসতেন। কিন্তু খ্যাতি, যশ ও ব্যক্তিত্বের জন্য কেউ কিছু বলতে সাহস করত না।

বিকাশদা প্রশ্ন করলেন, তো সেই চিনুদির কী হল?

দীনবন্ধু মারা যাবার পরই পুলিনবাবু ডিসপেন্সারী আর ল্যাণ্ডো বিক্রী করে চিনুদিকে নিয়ে দেশে চলে গেলেন।

অক্ষয়দার কাছে নানাজনের নানা কাহিনী শুনে ভাবতাম, সেকালে এসব সম্ভব ছিল কিন্তু আজকের যুগে চিনুদিকে নিয়ে দীনবন্ধুর প্রমোদ ভ্রমণ কেউ সহ্য করত না।

আমি মনে মনে আরো ভাবতাম, এ যুগের মানুষ অনেক রুচিবান, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান অনেক তীব্র। চোর, জোচ্চোর, লম্পট, বদমাইস, চরিত্রহীন নিশ্চয়ই আছে, চিরকাল থাকবেও কিন্তু সমাজের গণ্য-মান্য-বরেণ্যদের মধ্যে সে-সব দৈন্য-মালিন্য নেই।

একালে কলকাতার রাস্তার ধারের ভৈরবীদের নিয়ে গণ্য-মান্য পরিবারের ছেলে ছোকরাদের ফুর্তি করা বা রক্ষিতা রাখা সম্মান ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি গণ্য হলেও আজকের সমাজ অনেক এগিয়েছে।

সে বয়সে পৃথিবকে সবুজ শ্যামল মনে হত বলেই সব মানুষকে বিশ্বাস করতাম, নেতাদের শ্রদ্ধেয় ভাবতাম।

দিল্লীতে প্রথম যখন অধ্যাপক দেবকীনারায়ণ চৌধুরীকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে দেখলাম, তখন সত্যি ভাল লেগেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট, অক্সফোর্ডের পি. এইচ-ডি এবং ডি. লিট। এক কথায় মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। কথাবার্তায় অত্যন্ত অমায়িক। পরনে মালকোছা দিয়ে পরা খদ্দরের ধুতি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। সব সময় কাঁধে বইপত্র ভর্তি একটা ঝোলা।

অধ্যাপক দেবকীনারায়ণের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়

পার্লামেণ্ট লাইব্রেরীতে। জিরো আওয়ারের ঝড় কেটে যাবার পরই প্রতিদিন সেণ্ট্রাল হলে আড্ডা দিয়ে ছু-এক ঘণ্টা লাইব্রেরীতে কাটাই। দেশ-বিদেশের কাগজপত্র পড়তে পড়তেই রোজ দেখি, কোণার টেবিলে দেবকীনারায়ণবাবু আত্মমগ্ন হয়ে পড়ছেন বা নোটস নিচ্ছেন।

আলাপ করার লোভ হলেও বিরক্ত করতে দ্বিধা হত। তারপর হঠাৎ একদিন উনি দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র দেখার জন্য আমার পাশের চেয়ারে বসতেই আলাপ না করে পারলাম না।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই ঐ পার্লামেণ্ট লাইব্রেরীতে দেখা হয় কিন্তু লাইব্রেরীর মধ্যে কেউই বিশেষ কথা বলি না। কোন দিন শুধু হাসি হাসি মুখে শুভেচ্ছা বিনিময়। কোন দিন বা সামান্য ছু-একটি কথা।

দেবীনারায়ণ বিহারের লোক হলেও বেশ ভাল বাংলা জানতেন কিন্তু বাংলায় কথা বলতে পারতেন না। তাই উনি হিন্দীতে বা ইংরেজীতে কথা বললেও আমি সব সময় বাংলায় জবাব দিতাম।

কি বই নিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসার সাহেব?

আমার প্রশ্ন শুনে উনি হেসে বললেন, আমার সবচাইতে প্রিয় ঔপন্যাসিকের বই নিয়ে যাচ্ছি।

কে আপনার সবচাইতে প্রিয় ঔপন্যাসিক?

তারাশঙ্করবাবু।

তারপর উনি আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, পৃথিবীর যে কোন ভাষার যে কোন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের চাইতে তারাশঙ্করবাবু কম না। গণদেবতা বা ধাত্রীদেবতার মত বই ইংরেজী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশ ভাষায় লেখা হলে একবার না, ছ'তিনবার নোবেল প্রাইজ পেতেন।

কোন দিন আবার কাছে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেন, এখানকার বাংলা বইয়ের দোকানে কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' পাব?

আমি মাথা নেড়ে বলি, বোধ হয় না।

কলকাতার কোন্ দোকানে লিখলে বইটা পেতে পারি?

আমি একটা দোকানের নাম ঠিকানা বলি, উনি লিখে নেন। তারপর বলেন, আমার এক বন্ধু কেম্বি্রজে আছে। তাকে বইটা পাঠাতে হবে।

এই ভাবেই আস্তে আস্তে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়।

পার্লামেণ্টের খুব কাছেই আমার অফিস। মাঝে মাঝে উনি আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমার অফিসে আসেন আড্ডা দিতে। চা-কফি খেতে খেতে কত কি নিয়ে আমরা কথা বলি।

এই ভাবেই বছর খানেক কাটল।

তাপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার রদবদল করলেন এবং অধ্যাপক দেবকীনারায়ণ চৌধুরী এক লাফে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন। তাও কোন সাধারণ দপ্তরের না—একেবারে ইস্পাত ও খনি মন্ত্রণালয়ের।

টেলিফোনে অভিনন্দন জানাতেই উনি বললেন, আজই প্রাইম মিনিস্টার আমাকে বললেন, স্টীল এ্যাণ্ড মাইন্স-এর ভার নিতে হবে। আমি বললাম, চিরকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারী করেছি। এ দায়িত্ব কি আমি বহন করতে পারব?

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, প্রাইম মিনিস্টার কি বললেন?

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, পারবেন বলেই তো এই ভার আপনাকে দিলাম।

এসব কথা বলার পর অধ্যাপক দেবকীনারায়ণবাবু বললেন, যখনই সময় পাবেন, চলে আসবেন। সারাদিন তো ফাইলের মধ্যেই ডুবে থাকতে হয়। আপনার মত বন্ধু এলে তবু একটু মনের কথা বলতে পারব।

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, নিশ্চয়ই আসব।

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা সত্যি ব্যস্ত মানুষ। ইস্পাত ও খনি

মন্ত্রীর অধীনে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তে নানা ইস্পাত কারখানায় ও অসংখ্য খনিতে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করছে। উচ্চপদস্থ অফিসারের সংখ্যাই হাজার হাজার। সিদ্ধান্তে সামান্য ভুল-ত্রুটি হলে সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশের অর্থনীতির ওপর প্রতিক্রিয়া হবে। ইস্পাত কারখানা ও খনিগুলোর মধু খাবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক হাঙর-কুমীরের মত ওঁৎ পেতে বসে আছে। এই সবকিছু দেখাশোনা করা সহজ ব্যাপার নয়, এর ওপর আছে রাজ্যসভা ও লোকসভা। সেখানে জবাবদিহি করতে হবে প্রতি পদক্ষেপে। সামান্য ভুল হলেই সর্বনাশ।

এ সব জানি বলেই আমি দেবকীনারায়ণবাবুকে বিরক্ত করি না। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে দেখা হলে উনি জোর করে কফি খাওয়ান। টুকটাক গল্পও হয়, কিন্তু ওর অফিসে বা বাংলোয় যাই না। সময়ও হয় না। তবে মাঝে মাঝে ওর বাড়িতে পার্টি বা ডিনার থাকলে কাজকর্মের ক্ষতি করেও যেতাম।

এইভাবে বছর ঘুরে গেল। উনিও ব্যস্ত। আমিও বেকার না। যোগাযোগ বেশ ক্ষীণ হয়ে গেল।

পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হবার পরদিন এয়ার-কণ্ডিশান এক্সপ্রেসে কলকাতা আসছি। নিজের জায়গায় জিনিসপত্র রেখে প্ল্যাটফর্মে নেমে সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ অধ্যাপক দেবকীনারায়ণ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ঘোষ আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই উনি প্রশ্ন করলেন, কলকাতা যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। আপনি?

মিনিস্টারের সঙ্গে পাটনা যাচ্ছি।

খুশি হয়ে বললাম, যাক, তাহলে আড্ডা দিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটানো যাবে।

মিঃ ঘোষ বললেন, উনি ডি কম্পার্টমেন্টে আছেন।

উনি যে এয়ার-কণ্ডিসণ্ড ফার্স্ট ক্লাশে আছেন, তা মিঃ ঘোষ না বললেও আমি বুঝলাম।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেক পরে ভাবলাম, এবার অধ্যাপক দেবকীনারায়ণবাবুর সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া যাক। একটার পর একটা চেয়ার পার হয়ে এ-সি কোচ-এ হাজির হয়ে দেখি, মিঃ ঘোষ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখে উনি বললেন, মিনিস্টার ওঁর এক স্টুডেন্টকে রিসার্চের ব্যাপারে কি সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

এসেছি যখন একবার অন্তত দেখা করে যাই।

মিঃ ঘোষ একটু এগিয়ে ডি কম্পার্টমেন্টের দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে গেলেন। একটু পরেই উনি বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন।

দেবকীনারায়ণবাবু আমাকে সাদরে পাশে বসিয়ে ওপাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, আমার ছাত্রী বাসন্তী।

বাসন্তী হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করলেন। আমিও হাত তুলে ওকে নমস্কার করলাম। ওই নমস্কার করার সময়ই একবার ওকে ভাল করে দেখে নিলাম। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে সুন্দরী। তবে রঙটা একটু চাপা। বিরাট লম্বা বিনুনি ঘুরে এসে বুকের ওপর পড়ে আছে। সুন্দরী যুবতীদের বয়স বোঝা যায় না। তবু মনে হল তিরিশের আশেপাশে হবে। বাসন্তীর কোলের ওপর একটা মোটা খাতা আর খান দুয়েক বই।

দেবকীনারায়ণবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমি হঠাৎ মিনিস্টার হওয়ায় আমার ছাত্র-ছাত্রীরা বিপদে পড়েছে। এই বাসন্তী আমার আণ্ডারেই রিসার্চ করছিল।

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম, আপনার আণ্ডারে রিসার্চ করা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

বাসন্তী আমার কথায় খুশি হয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, ঠিক বলেছেন।

দেবকীনারায়ণবাবুও মহা খুশি। হাসি উপচে পড়ছে। বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন সৌভাগ্যের ঠেলায় তো দিল্লী ছুটতে হচ্ছে।

তাতে কি হল, তু'তিন মাস অন্তর আমি পাঁচ-সাত দিনের জন্য আসব।

বাসন্তীর কথায় উনি যেন আরো খুশি হন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার এই হচ্ছে পুরস্কার।

বাসন্তী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি, স্যার দারুণ পপুলার। তাছাড়া ওঁর কাছে পড়াশুনা বা রিসার্চ করলে আর কোন প্রফেসারকে ভাল লাগে না।

আঃ! বাসন্তী, কি বলছ?

ঠিক বলছি স্যার।

তিনজনে কফি খেতে খেতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। জানলাম, তু'তিন দিন আগেই বাসন্তী দিল্লী এসেছিলেন। এই ট্রেনেও পড়াশুনা আলাপ-আলোচনা চলছে।

বাসন্তীর পড়াশুনার ক্ষতি করব না বলে কফি খেয়েই উঠে দাঁড়ালাম। দেবকীনারায়ণবাবু বললেন, আপনি কি চেয়ার কার-এ আছেন?

হ্যাঁ।

বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন, কত নম্বর কোচ-এ আছেন?

এক নম্বর কোচ-এ।

আমারও সীট এক নম্বরে।

আমি হেসে বললাম, তাহলে তো দেখা হবেই।

নিশ্চয়ই।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার কিছুক্ষণ পর বাসন্তী আমাদের কোচ-এ

ঢুকে একেবারে সামনেই আমাকে বসতে দেখে বলল, আপনার সীট এইটা ?

হ্যাঁ। কেন ?

আপনার পিছনেই তো আমার সীট।

আমি হেসে বললাম, পার্লামেণ্ট আর রেলওয়ে বোর্ডের কোটার সীটগুলো এক জায়গাতেই হয়।

উনি সীটে বসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, খেয়েছেন ?

হ্যাঁ। স্যার না খেয়ে আসতে দিলেন না।

ঠিক দশটার সময় কোচ-এর বড় আলোগুলো অফ হবার পর নাইট ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠল। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট খাবার জন্য বাইরে এলাম। কিছুক্ষণ পর বাসন্তী বাইরে আসতে জিজ্ঞেস করলাম, ঘুমুবেন না ?

রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনার অভ্যাস। তারপর এই ট্রেন। হয়তো সারা রাতই ঘুমুতে পারব না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, অনেকের ট্রেনে ঘুম হয় না।

আপনার ?

আমি মহানন্দে ঘুমুতে পারি। তবে মাঝে মাঝেই সিগারেট খাবার জন্য বাইরে আসি।

আগে স্যারও খুব সিগারেট খেতেন।

কিন্তু এখন তো আর খান না।

বাসন্তী হেসে বললেন, আমরা দু'তিনজন ছাত্রী অনেক দিন ধরে পিছনে লেগে তবে ছাড়িয়েছি।

হেসে বললাম, তাহলে তো আপনি মোটেও নিরাপদ না।

উনি হেসে বললেন, না, না, আপনার ভয় নেই।

আমি সামান্য একটু হাসি-ঠাট্টা করলেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ছাত্রীদের কাছে দেবকীনারায়ণবাবু কত জনপ্রিয়, কত কাছের মানুষ। উনিও যে ছাত্র-ছাত্রীদের কত ভালবাসেন, তা বুঝতেও অসুবিধে হল না।

পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে মাঝে মাঝে দেবকীনারায়ণ বাবুকে বসন্তীর কথা জিজ্ঞেস করি। উনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেন, আমি ঠিক মত গাইড করতে পারছি না বলে ওর খুব ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে পারি কিন্তু এত বড় মিনিস্ট্রীর কাজ সামলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

তা তো বটেই।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, মুস্কিল হচ্ছে বাসন্তী এত দূর এগিয়েছে যে এখন নতুন গাইডের আণ্ডারে কাজ করলেও আমার সাহায্য ওর দরকার।

উনি এবার একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বেচারী ছ'মাস ধরে আসতে চাইছে কিন্তু কবে যে ওকে আসতে বলব, তা ভেবে পাচ্ছি না।

জরুরী কাজ ছিল বলে দেবকীনারায়ণবাবু আর বসলেন না, চলে গেলেন। আমিও প্রেস গ্যালারীতে গেলাম।

সেদিনই পার্লামেণ্ট হাউস থেকে বেরুবার সময় দেখি, মিঃ ঘোষ হন হন করে চলেছেন। মুখোমুখি হতেই জিজ্ঞেস করলাম, এমন ছুটে চললেন কোথায়?

ওয়েস্টার্ন কোর্ট থেকে বাসন্তীদিকে নিয়ে ডিল্যুক্সে চড়িয়ে দিতে হবে।

আমি ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেও ওকে বুঝতে দিলাম না। অত্যন্ত উদাসীনভাবে বললাম, কোন্ বাসন্তী? প্রফেসর সাহেবের যে ছাত্রীর সঙ্গে ট্রেনে...

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বেশ মেয়েটি। তা ও মাঝে মাঝেই দিল্লী আসে বুঝি?

দু'এক মাস অন্তরই আসেন। মাঝে মাঝে স্যারের সঙ্গে কনসাল্ট না করলে তো উনি রিসার্চ করতে পারবেন না।

মিঃ ঘোষ আর কোন কথা না বলে প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের স্কুটারে চড়ে চলে গেলেন।

রহস্যের ইঙ্গিত পেয়ে চুপ করে থাকতে পারলাম না। আধঘণ্টা পরে ওয়েস্টার্ন কোর্টের রিসেপ্‌সনে ফোন করে বললাম, স্টীল এ্যাণ্ড মাইন্‌স মিনিস্টারের গেস্ট বাসন্তীকে একটু ডেকে দেবেন?

উনি তো এক্ষুণি স্টেশনে রওনা হলেন।

ও, তাই নাকি। আমি খুব হতাশ ভাবে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেও মনে মনে দারুণ খুশি হলাম।

বুঝলাম, অধ্যাপক দেবীনারায়ণ চৌধুরী এম. এ (ক্যাল), পি. এইচ-ডি (অক্সফোর্ড), ডি. লিট (লণ্ডন), মিনিস্টার ফর স্টীল এ্যাণ্ড মাইন্‌স, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া শুধু পণ্ডিত ও খ্যাতনামা অধ্যাপক না, সুরসিকও। ঐ গেরুয়া পাঞ্জাবি আর মাঝখানের সিঁথি দেখে যতটা সাধু মনে হয়, উনি তত সাধু না।

পার্লমেণ্টের দুটো খবর টাইপ করে পাঠিয়ে দেবার পর দেবকীনারায়ণবাবুর বাংলোয় ফোন করলাম ওর স্ত্রীকে।

কেমন আছেন বৌদি?

ভালই। আপনি?

সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত এত কাজে ব্যস্ত থাকি যে ভাল আছি না মন্দ আছি, বুঝতে পারি না।

বৌদি হাসতে হাসতে বললেন, দিল্লীতে কি মিনিস্টার—জার্নালিস্ট সকলেরই এক অবস্থা?

তার মানে?

আপনাদের প্রফেসর সাহেব তো গত দিন দশেক বাড়িতে একবেলাও খাবার সময় পান নি।

আমি ন্যাকামী করে বললাম, দিনে সত্যি বাড়িতে খেতে যাওয়া মুসকিল কিন্তু রাত্তিরে…

বৌদি আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, দিন দশেক উনি এমনই গোপন পলিটিক্যাল কাজে ব্যস্ত ছিলেন যে রাত বারোটা-একটার আগে কোন দিনই বাড়ি ফিরতে পারেন নি।

আমি একটু হেসে বললাম, বৌদি, কিছু কিছু মন্ত্রীর এমন পলিটিক্যাল কাজ থাকবেই।

অধ্যাপক দেবকীনারায়ণ চৌধুরীকে যত সাধু মনে হয়, উনি আসলে তা নন জানার পরই আমিও কিরীটি রায় হবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ভাগ্যক্রমে ওর ব্যক্তিগত বেয়ারা জনার্দন ছিল আমার একান্ত বিশ্বস্ত। জনার্দন দ্বারভাঙ্গার লোক। বহু বছর ধরে দিল্লীতে আছে এবং অধ্যাপক সাহেবকে সেবা করার আগে প্রায় ডজনখানেক মন্ত্রীর ব্যক্তিগত বেয়ারার কাজ করেছে। তাই ও অনেকের অসংখ্য ভাল-মন্দ কাহিনী জানে। একবার ওকে নিয়ে একটা ফিচার লিখেছিলাম বলে জনার্দন আমাকে অত্যন্ত ভালবাসত, সম্মানও করত।

একদিন জনার্দন নিজেই আমাকে পার্লামেণ্ট হাউসের এক কোণে একলা পেয়ে বলল, আচ্ছা বাবুজি, এত পড়াইলিখাই জানা আদমী খারাপ হয় কেন বলতে পারো?

আমি হেসে প্রশ্ন করলাম, কোন্ পড়াই-লিখাই জানা লোক আবার খারাপ হল?

জনার্দন আশেপাশে চেয়ে দেখে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, এই আমার মিনিস্টার সাহাবের কথা বলছিলাম।

কেন, কি হল?

বৃদ্ধ জনার্দন মুখ বিকৃত করে বলল, পাটনা থেকে এক ছোকরি আসে সাহাবের কাছে পড়াই-লিখাই করতে—মাগার পড়াই-লিখাই কিছু হয় না···

তবে?

দুজনেই বহুত গন্ধা কাম করে বাবু—

আমি অবাক হয়ে বলি, বল কি?

হাঁ বাবুজি, আমি আপনাকে ঝুট বলব না। মেমসাহাব কলকাত্তা বা পাটনা গেলেই বাসন্তী দিল্লী আসবে। আর ওরা বিলকুল স্বামী-স্ত্রীর মত থাকে।

মেয়েটির নাম বুঝি বাসন্তী ?

হাঁ বাবুজি। আর বাসন্তীদিদি দিল্লী এলেই সাহাব আমাকে দেখ-ভাল করার ডিউটি দেন। আমি সাহাবকে কিছু বলতে পারি না কিন্তু আপনিই বলুন বাবুজি, এই বয়সে এই রকম ডিউটি করতে ভাল লাগে ?

তোমায় কি ডিউটি দিতে হয় ?

সারাদিন কোন তকলিফ হয় না, কিন্তু সন্ধ্যার পর সাহাব এলে যা কারবার হয়, তা আমার বহুত খারাপ লাগে।

আমি চুপ করে থাকি। জনার্দন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে থাকে, শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে কাজ করে মনে হত দেবতার সেবা করছি। কেন, গ্যাডগিল সাহেব ? অমন ভালো আদমী আর হবে না। আর এই বুড়া বয়সে এ কার সেবা করছি ? বলতে বলতে ম্লান হাসে জনার্দন, রিটার হবার পরদিনই দিল্লী ছেড়ে পালাব।

বাসন্তীর কৃপায় অধ্যাপক সাহেবের জীবনে নতুন করে বসন্তোৎসব শুরু হবার পর প্রাইভেট সেক্রেটারী ঘোষের মনেও জোয়ার এলো। লোদী কলোনীর সরকারী ফ্ল্যাটের বর্ষাতির ঘরে ঘোষসাহেব ভাড়াটে আনলেন। এক বিপত্নীক ভদ্রলোক তার দুটি সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে এলেন—কিন্তু এই ছোট্ট তিনজনের সংসার চালাতেই উনি হিমসিম খেয়ে যান। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উনি একদিন মিঃ ঘোষকে বললেন, যা দিনকাল পড়েছে তাতে পেনসনের সামান্য ক'টা টাকায় আর কুলিয়ে ওঠে না। তাই বলছিলাম, যদি মেয়ে দুটোকে কোথাও একটু ঢুকিয়ে দেন, তাহলে বড়ই উপকার হয়।

মনে মনে খুশি হয়ে মিঃ ঘোষ বললেন, চেষ্টা করব নিশ্চয়ই তবে ওরা তো বিশেষ পড়াশুনা করে নি, তাই···

অফিস না হলে অন্য কোথাও কিছু হলেও কোন আপত্তি নেই। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন স্বগতোক্তি করেন, ওরা যদি সংসারটা চালাতে পারে তাহলে আমি দেনা-টেনাগুলো শোধ করতে পারি।

মিঃ ঘোষ বললেন, আরতি কি ক্যান্টিনের অফিসে কাজ করতে পারবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে।

তবে ক্যান্টিন পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ হলেও অফিসের কাজ চলে কিন্তু রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত।

তাতে কি হল?

আচ্ছা, কথা বলব।

হাজার হোক মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। ক্যান্টিন অফিসের সামান্য কেরানী—এ আর এমন কি? দিন কয়েক পরেই আরতি একদিন সেজেগুজে মিঃ ঘোষের স্কুটারের পিছনে বসে উদ্যোগ ভবন রওনা হল। রাত্তির ন'টার পর আরতি আবার মিঃ ঘোষের স্কুটারের পিছনে বসেই বাড়ি ফিরল।

শুধু প্রথম দিন নয়, এটাই নিয়মিত হত।

অধ্যাপক দেবকীবাবুর ছাত্রীপ্রীতির খবর যেমন তাঁর অফিসের কর্মচারীদের কাজে অজানা ছিল না, তেমনি আরতিকে নিয়ে মিঃ ঘোষের নিয়মিত সান্ধ্য প্রমোদ ভ্রমণের কাহিনীও চাপা রইল না।

ঠিক এমন সময় কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অতিথিশালা নিজাম প্যালেসের ভি-আই-পি স্যুইটে একটা অঘটন ঘটল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক দেবকীনারায়ণ চৌধুরী তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ঘোষকে নিয়ে কলকাতা এসেছেন। উঠেছেন নিজাম প্যালেসের ভি-আই-পি স্যুইটে। মন্ত্রীর ঘরের পাশেই তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর ঘর।

মন্ত্রী সারাদিন অফিসারদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর বিশ্রামের জন্য ঘরে ঢুকতেই দেখেন বাসন্তী দাঁড়িয়ে আছে।

তুমি?

বাসন্তী অধ্যাপককে প্রণাম করে বললেন, ক'দিন হল কলকাতায় এসেছি। রেডিওতে শুনলাম আপনি এসেছেন। তাই…

বেশ, বেশ। এসো, ভেতরে এসো।

ধূর্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী মনে মনে বুঝলেন, পূর্ব নির্ধারিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী অভিনয় হল। উনি আরো জানতেন, বাসন্তী শুধু দেখা করতে আসে নি। কলকাতায় আরতি নেই কিন্তু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যবসাদার আছেন। তাদের সঙ্গে খানাপিনার প্রোগ্রাম আছে। তাই বাসন্তীকে নিয়ে মিনিস্টার সাহেব ঘরে ঢুকতেই মিঃ ঘোষ সবিনয়ে নিবেদন করলেন, স্যার, কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতাম। যদি আপনার কোন কাজ না থাকে তাহলে···

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা করবেন। আর সারাদিন কাজ করার পর এখন আবার কি করব? বাসন্তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই আমি শুয়ে পড়ব।

ব্যবসাদার বন্ধুদের সঙ্গে খানাপিনা ও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগের পর্ব শেষ করে মিঃ ঘোষ যখন নিজাম প্যালেস ফিরলেন, তখন রাত প্রায় একটা। পানের পরিমাণটা একটু বেশী হবার জন্য মিঃ ঘোষ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভাঙার পরই বিড় বিড় করে বললেন, এ কি স্বপ্নের সিঁড়ি বাবা! শেষ আর হয় না—

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছলেন ঘরের সামনে। তারপর সামান্য ভুলের জন্য হঠাৎ দরজা খুলেই দেখেন, মন্ত্রী আর বাসন্তী আদিমতম খেলায় মত্ত!

মুহূর্তে সব নেশা ছুটে গেল। এক লাফে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তার পরই নিজের ঘরে ঢুকেই বসে পড়লেন। পরের কয়েকটি দৃশ্য নেপথ্যেই অভিনীত হল।

মঞ্চে যখন আলো জ্বলে উঠল, তখন দেখা গেল কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক দেবকীনারায়ণ চৌধুরীর থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ ভূতপূর্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ঘোষ স্টেট ট্রেডিং

কর্পোরেশনের ডেপুটি ডিভিশন্যাল ম্যানেজার।

জনার্দন খবরটা দিয়ে বলল, বলুন বাবুজি, কত পড়াই-লিখাই জানা লেড়কা-লেড়কী একটা সাধারণ নোকরীর জন্য পাগল হয়ে ঘুরছে। আর আমাদের ঘোষবাবু স্রেফ স্কুল পাশ করে এত বড় অফিসার হয়ে গেল!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, জনার্দন, তোমার মিনিস্টার একে মহাপণ্ডিত, তার ওপর এক নম্বরের ভদ্দরলোক! তাই তো তিনি এত মহানুভব!

আরে বাবুজি, পণ্ডিত মন্ত্রী কি আমি দেখি নি? শ্রীনিবাসবাবু তো আরো বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছেও তো কত ছাত্র-ছাত্রী আসত, থাকত, কিন্তু কোন দিন তাঁকে কোন গন্ধা কাম করতে কেউ দেখি নি।

আমি মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ওঁর মত পণ্ডিত লোক আজ পর্যন্ত মন্ত্রী হয় নি। কলকাতার পি. আর. এস, পি. এইচ-ডি এবং ডি. লিট হওয়া সহজ ব্যাপার না।

জনার্দন চোখ বড় বড় করে বলে, আরে বাবুজি, কি বলব? উনি ছাত্র-ছাত্রীদের দেখিয়ে আমাদের বলতেন, এরা আমার ছেলেমেয়ে। দেখ, দিল্লীতে এসেছে বলে আমার ছেলেমেয়েদের যেন কোন কষ্ট না হয়!

আমি শ্রীনিবাস বাবুর ছাত্র না, কিন্তু আমার অনেক পরিচিত ছেলেমেয়ে ওঁর ছাত্র। তাই জনার্দনের কাছে কলকাতার এই জনপ্রিয় অধ্যাপক ও ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর প্রশংসা শুনে আমার গর্ব হচ্ছিল।

জনার্দন বলল, আর একটা ঘটনা শুনুন বাবুজি···

বল।

সাহেবের সঙ্গে এলাহাবাদ গিয়েছি। সাহেব আসছেন খবর পেয়ে কানপুর না লক্ষ্ণৌ থেকে এক ছাত্রী ওঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে এসে ফেরার সময় ট্রেন ফেল করলেন।

তারপর?

দিদি সার্কিট হাউসে ফিরে এলে সাহেব আমাকে বললেন, জনার্দন, তোমার দিদি এই ঘরেই শোবে। তুমি পাশের ড্রেসিং-রুমে আলো জ্বালিয়ে শুয়ে থাকবে। নয়তো ও হয়তো রাত্রে ভয় পাবে। আমি কোণার দিকের ছোট্ট ঘরে চলে যাচ্ছি···

তাই নাকি?

হাঁ বাবুজি, সব সাচ্ বলছি। জনার্দন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শ্যামাপ্রসাদবাবু থেকে শুরু করে গ্যাডগিল বা শ্রীনিবাসবাবুর মত দেওতার সেবা করার পর এখন আর এই সব ভাল লাগে না।

আমি হেসে বললাম, আর ক'দিন? এবার তো তুমি রিটায়ার করবে।

হাঁ বাবুজি, রিটার করার পর আর একদিনও আমি মিনিস্টার সাহেবের কাছে থাকতে চাই না।

এ বিশ্ব-সংসার সত্যি বড় বিচিত্র। যে সূর্যের কৃপায় পৃথিবীর বুকে জীবের জন্ম, সেই সূর্যের বুকে কোন জীবের জন্ম সম্ভব নয়। যে চাঁদের স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র আলো মানব জীবনের শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কত স্বপ্ন রচনা করে, সেই চাঁদের রাজ্যে সীমাহীন রুক্ষতা নিত্য বিরাজমান। এই পৃথিবীর মানুষগুলোও কি কম বিচিত্র! পাদপ্রদীপের আলোয় যাদের সভ্য, মার্জিত, আদর্শবান মনে হয়, তাদের মধ্যে কত দৈন্য, কত মালিন্য। আবার যাদের আমরা দূরে সরিয়ে রাখি ঘৃণায়, তাদের মধ্যে কত না মহত্ত্ব, কত না ঔদার্য!

মনে পড়ছে মিঃ রায়ের কথা। জাপান সম্রাটের জন্মদিনে জাপানীজ কনস্যুলেটের পার্টিতে আমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয় ক্যালকাটা ক্লাবে। সে অনেক বছর আগের কথা। প্রথম দিনই ওকে ভাল লেগেছিল। তাই উপযাচক হয়ে আলাপ করেছিলাম। মিঃ রায় দু'টি বিখ্যাত বিদেশী পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখতেন। অনভিজ্ঞতার জন্য তখন আশা করেছিলাম, উনি সাহায্য করলে আমিও বিদেশী পত্রিকার সংবাদদাতা হতে পারব।

ভাল লাগা আর মনে এই ক্ষীণ আশা বুকে নিয়েই একদিন ওর ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে হাজির হলাম।

ঘরে ঢুকেই আমি অবাক। বই আর কাগজপত্রে ভর্তি দুটি ঘরে পা রাখার জায়গা নেই। টেবিলের ওপর বেবী হার্মেস টাইপরাইটার পত্র-পত্রিকার ঠেলাঠেলিতে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম। সোফা, চেয়ার আর সেণ্টার টেবিলের ওপরেও বইপত্তর ছড়ানো। আর ঘরের এক কোণে দুটি বস্তাভর্তি খালি বোতল। বুঝলাম, মিঃ রায় পড়াশুনা আর মদ্যপান সমান তালেই চালান।

ভদ্রলোকের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার জন্য মাঝে মাঝেই ওখানে যাই। নানা রকম কথাবার্তা গল্পগুজবের সঙ্গে চলে চা-কফি। কোন কোন দিন খাওয়া-দাওয়াও করি। মতিলালই সব কাজ করে। সে মিঃ রায়ের বেয়ারা-কাম-কুক-কাম-বাটলার-কাম-বার বয়-কাম-পার্সোন্যাল সেক্রেটারী-কাম-রিসেপসনিস্ট।

কোন কোন দিন মিঃ রায় আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েন। জামা-প্যাণ্ট পরার জন্য আলমারী খুলেই উনি বলেন, ওরে মতি, আজ কোন্ জামা-প্যাণ্ট পরব রে?

মতিলাল রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে ওর জামাকাপড় বের করে দেয়। তারপর উনি জামাকাপড় পরলেই মতি ওর পেন আর পার্স এগিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে মতি চেক বই এনে ওর সামনে ধরে বলে, একটা চেক সই করে দিন। হাতে একেবারে টাকা নেই। মিঃ রায় বিনা প্রশ্নে চেক সই করে দেন।

সব মিলিয়ে মানুষটিকে বেশ ভাল লাগে।

একদিন মিঃ রায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস স্টপের দিকে এগুতেই কলেজের এক পুরানো বন্ধু সুমিতের সঙ্গে দেখা। বলল, তুই এখানে?

হেসে বলি, এ পাড়ায় আমি মাঝে মাঝেই আসি।

মাঝে মাঝেই আসিস? কত নম্বর বাড়িতে?

উনিশ নম্বরে তিনতলায় একজন জার্নালিস্ট থাকেন···

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুমিত বলল, তুইও ঐ লম্পটটার খপ্পরে পড়েছিস?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি যা তা বলছিস?

সুমিত মুচকি হেসে বলল, যা বলছি শুনে রাখ। ও হারামজাদা সারা দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকে। আর কোন দিন আমেরিকান, কোন দিন জার্মান মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হতেই পারে না। তবে যেহেতু উনি বিদেশী কাগজে কাজ করেন, সেই জন্য বিদেশী ছেলেমেয়ে কখনও কখনও ওর কাছে আসে।

কেবল সুমিত না, ও-পাড়ার বহুজনেই মিঃ রায়কে মাতাল চরিত্রহীন বলেই বিশ্বাস করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিকও ওকে বলতেন, আন্‌টাচেবল্।

এই সব ঘটনার কিছু দিন পরেই আমি কলকাতা ছেড়ে দিল্লী চলে যাই। কালে-কস্মিনে মিঃ রায় দিল্লী এলেও সব সময় আমাদের দেখাশুনা হত না কিন্তু সুমিত অফিসের কাজে দিল্লী এলেই আমার সঙ্গে দেখা করত।

একবার সুমিত আমাকে বলল, তোর ঐ মিঃ রায় এখন আর ফরেনার ছুঁড়ীদের নিয়ে রাত কাটায় না। ও শালা বেশ কিছুকাল একটা রিফিউজী মাগীকে নিয়ে আছে।

কথাটা শুনে বিশ্বাসও হয় না, ভালও লাগে না। বলি, যে যা ইচ্ছে করুক।

এরপর ও যতক্ষণ ছিল শুধু মিঃ রায়ের নিন্দাই করল।

আমি আর একটি কথা বললাম না। সুমিত চলে গেল।

মাঝে মাঝে কলকাতা এলেও ব্যস্ততার জন্য মিঃ রায়ের ওখানে যেতে পারতাম না কিন্তু সুমিত আসার দু'এক মাস পর কলকাতা গিয়ে ফোন করলাম।—হ্যালো!

অপর প্রান্তে নারীকণ্ঠ শুনে আমি বিস্মিত হলেও সহজ ভাবেই বললাম, মিঃ রায় আছেন ?

না। উনি কাটমাণ্ডু গিয়েছেন।

কবে ফিরবেন ?

বোধ হয় রবিবার। কিন্তু আপনি কে বলছেন ?

আমি আমার নাম-ধাম বলার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রবিবার পর্যন্ত আছেন তো ?

না, আমি কালই চলে যাব।

উনি ফিরলেই আমি আপনার কথা বলব।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানাতেই উনি নমস্কার জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবি, কে এই মহিলা ? মিঃ রায়ের রক্ষিতা ? সুমিত কি তাহলে ঠিকই বলেছে ?

কিন্তু সত্যি কী ঐ মহিলা মিঃ রায়ের রক্ষিতা ছিলেন ?

না। তবে ? সে এক কাহিনী।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে মোহনলাল স্ট্রীটের পাশে এক বন্ধুগৃহে মিঃ রায় মাঝে মাঝে আড্ডা দিতেন। আড্ডা হত সন্ধ্যার পর। গল্পগুজবের সঙ্গে চলত মদ্যপান। সেই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া।

সেদিন বন্ধুগৃহে আড্ডা দিয়ে মিঃ রায় বেরুলেন এগারোটা নাগাদ। সময়টা নভেম্বরের গোড়ার দিক—ঠাণ্ডা পড়ে ভোরে আর বেশী রাতের দিকে। রাত এগারোটাতেই শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় প্রায় ফাঁকা।

নেশার ঘোরে বিভোর হয়ে আপন মনে রাস্তা পার হতে গিয়েই কে যেন ওর একটা পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল—বাবা আমাকে একটু আশ্রয় দাও বাবা। আমি বড়ই দুঃখী। আমার কেউ নেই।

কে। চমকে উঠলেন মিঃ রায়।

বন্ধুর ঔদার্যে দুটো চোখের দৃষ্টিই কেমন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। একবার মনে হল, একটা বুড়ো। না, না, বুড়ো না তো! মেয়েছেলে! ঠিক দেখছি তো?

আবার সেই কাতর প্রার্থনা, এখানে আমার কেউ নেই বাবা। তুমি আমাকে একটু আশ্রয় দাও। কত লোকের পায়ে ধরলাম কিন্তু···

থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন মিঃ রায়। তার পরই বললেন, চল, আমার সঙ্গে।

বাড়িতে পৌঁছে মতিলালকে মিঃ রায় বললেন, মেয়েটিকে কিছু খাইয়ে ভিতরের ঘরে শুতে দে।

মতিলাল অবাক হলেও কোন প্রশ্ন না করে মিঃ রায়ের আজ্ঞা পালন করল।

পরের দিন দুপুরের দিকে মিঃ রায় বেরুবেন, মেয়েটি ওর সামনে এসে বলল, তুমি খেয়ে যাবে না বাবা?

মিঃ রায় মুখ না তুলেই বললেন, আমি এখন খাই না।

কিন্তু মতি যে বলল, তুমি একবার বেরুলে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। বলতে বলতে মেয়েটি ওর দুটি হাত ধরল, আমি যে তোমার জন্য রান্না করেছি বাবা!

এবার মিঃ রায় মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন।

তুমি না খেলে আমি খাব কেমন করে? তুমি একটু অপেক্ষা কর বাবা। আমি এখুনি খেতে দিচ্ছি।

মিঃ রায় কোন কথা না বলে খেয়ে-দেয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে যান।

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় কোন না কোন ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মদ খান মিঃ রায়, কিন্তু সেদিন আর কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতে ইচ্ছা করল না। ফিরপোর বারের এক কোণে একটা টেবিলে বসে একলা হুইস্কী খেতে খেতে বার বারই গঙ্গার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। কতই বা বয়স? বড় জোর তিরিশ-বত্রিশ।

মতি বলছিল, ওর বুড়ো স্বামী কালা জ্বরে মারা যাবার পর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের খোঁজে খুলনা আসে। সেখানে একটা লোক ওকে জানায়, সে আত্মীয় নাকি কলকাতায় চলে গেছে।

তারপর ওই লোকটার সঙ্গেই গঙ্গা কলকাতা আসে—কিন্তু ক'দিন ফুর্তি করার পরই লোকটা উধাও হয়ে যায়।

মিঃ রায় গঙ্গাকে খুব ভাল করে দেখেন নি কিন্তু তবু মনে হল, দেহের বাঁধুনী এমনই আঁটসাট যে মনেই হয় না, তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। এমন বয়সের, এমন দেহের মেয়ে নির্বিকার ভাবে ওকে বাবা বলে ডাকল? এই বয়সের মেয়ে কি ওর মা হতে পারে?

মতি না, গঙ্গাই দরজা খুলে দিলেন। মতি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে। মিঃ রায় ঘরে ঢুকতেই গঙ্গা জিজ্ঞেস করলেন, কাজ শেষ হল বাবা?

ও কথার জবাব না দিয়ে একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি ঘুমোওনি কেন?

তুমি ফেরার আগেই আমি ঘুমোব? তাই কি হয়?

গঙ্গা নিজে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে এই সব কথা বলছিলেন।—জানো বাবা, ওর মুখ থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুত কিন্তু তখন জানতাম না ওটা মদের গন্ধ। তারপর একদিন এত মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল যে মতি পর্যন্ত অবাক। আমি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েই কেঁদে ফেললাম।

কিছুক্ষণ পর মিঃ রায় আস্তে আস্তে চোখ খুলে ওকে দেখে বললেন, তুমি কাঁদছ?

যে ছেলে এত মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে, তার মা কাঁদবে না?

তুমি সত্যি আমার মা?

সত্যি-মিথ্যে তো জানি না বাবা। মনে মনে আমি তোমাকে ছেলেই মনে করি।

মিঃ রায় একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি কি চাও আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিই ?

তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে। যা ভাল মনে কর, তাই করবে। তবে তুমি এত মদ খেলে আমার বড় কষ্ট হয়।

গঙ্গা কাঁদতে কাঁদতেও স্নিগ্ধ হেসে বললেন, বিশ্বাস কর বাবা, তার পরদিন থেকে ও আর মদ খায় নি।

কিন্তু পর মুহূর্তেই ওর মুখের হাসি বিদায় নেয়। চাপা কান্না কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমি তো ছেলের চাইতে কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছোট। তাই বদনাম দিত পাড়ার লোকজন। আমি লেখাপড়া না জানলেও সব বুঝতে পারতাম। পাড়ার লোকেরা ওকে কত টিটকিরি দিয়েছে কিন্তু ও কিচ্ছু গায়ে মাখত না। একবার ওর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে পাড়ার ছেলেরা পিছন থেকে কত কি যা তা বলল। সেদিন রাত্রেই আমি ওকে বললাম, শোন বাবা, কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

মিঃ রায় বলেন, আমাকে বুঝি আর ভাল লাগছে না ?

না, তা নয় বাবা। আমার জন্য তুমি আর কত অপমান সহ্য করবে ?

উনি আবার হাসেন। বলেন, তুমি আমার বাবার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বলে কি আমার মা না ? পাড়ার লোকজন কে কি বলল, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। তাছাড়া তুমি জানো না কলকাতার লোকজন এ ধরণের কথাবার্তা বলে।

মতি চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সে এগিয়ে এসে আমাকে বলল, একদিন সাহেব হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, দেখ মতি, দু-চারদিনের মধ্যে একটু সময় করে মাকে নিয়ে একবার ব্যাঙ্কে যাবি। মিত্তিরকে সব বলা আছে। কয়েকটা কাগজে মা'র টিপ সই দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই।

মতি বলল, সাহেব প্রচুর আয় করলেও আগে তো সবই মদ খেয়ে, ওড়াতেন। পরে মদ খাওয়া কমাতে খরচ অর্ধেক হয়ে যায়। আর উনি হঠাৎ মারা গেলে মা বিপদে পড়বেন ভেবে টাকা জমিয়ে গেছন।

আমি হাসি। মতিও হাসল। বলল, আমি সাহেবের ষোল বছর কাজ করলাম। আগে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি, আমার সাহেব টাকা জমাবেন।

মতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, জানেন বাবু, সাহেব মারা যাবার আগে শেষ কথা কি বলেছেন?

আমি কিছু না বলে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাই।

বললেন, দেখিস মতি, আমার মা'র যেন কষ্ট না হয়। এই কথা বলেই মতি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই কথা বলার দু'মিনিটের মধ্যেই সব শেষ।

হঠাৎ গঙ্গা চিৎকার করে বললেন, চুপ কর মতি, চুপ কর। ও কথা আর আমাকে শোনাবি না।

বলতে না বলতেই উনি মূর্চ্ছা গেলেন।

এই মিঃ রায়ই নাকি লম্পট বদমাইস ছিলেন। ভদ্দরলোকের পাড়ায় উনি নাকি কলঙ্ক ছিলেন।

আলোয়-ছায়ায়, কলঙ্কে-মহিমায় এই মা ধরিত্রী যেমন আমাদের প্রণম্য, তেমনি তার সন্তানরাও কম শ্রদ্ধেয় নয়।